দরাফ খান গাজী

ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস

(সচিত্র)

মোজাম্মেল হক,

প্রণীত
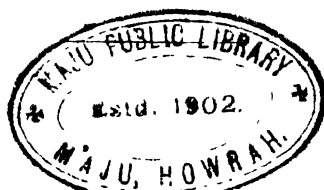
প্রথম সংস্করণ

কার্ত্তিক ; ১৩২৬

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

প্রকাশক ঃ—ময়ীনউদ্দীন হোসায়ন, বি-এ,
নূর লাইব্রেরী ; পাবলিশার
১০ নং সারেং লেন ; কলিকাতা

এজেণ্টস্ ঃ—
মোসলেম পবলিশিং হাউস
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
৩ নং কলেজ স্কয়ার ; কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার
সূর্য্য প্রেস
৩৩ নং গৌড়ীবেড় লেন ; কলিকাতা

বঙ্গের মোস্‌লেম-কুল-গৌরব-রবি

অকৃত্রিম মোস্‌লেম-হিতৈষী

বদান্যবর

স্বর্গীয়

নবাব সার খাজা সলিমুল্লা

জি. সি. আই. ই., কে. সি. এস্‌. আই.

বাহাদুরের

স্মরণে

বিজ্ঞাপন

ভিন্ন জাতীয় লেখকের তুলিকায় আমাদের বাদশাহ্-নবাব, আমীর-ওম্‌রাহ, সাধু-দরবেশ এবং সাধারণ মুসলমান-চরিত্র অকারণে মসীর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক মোস্‌লেম মনস্বী পুরুষ, যাঁহাদের মাহাত্ম্য-মহিমার উপরে খোদকারী ফলাইবার উপায় নাই, যাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্র-গৌরব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া সর্ব্ব লোকের ভক্তি-প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহাদিগকেও কেহ কেহ নিজেদের দিকে টানিয়া আনিয়া 'ইনি হিন্দু-কুলোদ্ভূত', 'উনি মুসলমান হইয়াও হিন্দুর দেব-দেবীর পরম ভক্ত', 'তিনি দেবতার প্রসাদ নিত্য খাইতেন', ইত্যাকার অসঙ্গত উক্তি করিয়া আত্ম-তৃপ্তি লাভের সহিত নিজেদের সহৃদয়তা দেখাইয়া থাকেন। আমরা বলি, তাঁহাদের সেইরূপ সহৃদয়তা—সেইরূপ অযৌক্তিক স্তুতিবাদ করাটাও মুসলমান-চরিত্রে কলঙ্কারোপ করা—শাদাকে কালো করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

উল্লিখিতরূপ খাম-খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ত্রিবেণী-বিজয়ী ধর্ম্মপ্রাণ তাপস মহাত্মা জাফর খান গাজীকে গঙ্গাভক্ত মুসলমান এবং একটী গঙ্গার স্তব তাঁহারই রচিত বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। "দরাফ খাঁ" নামে এক খানি উপন্যাসে এ বিষয়ের চূড়ান্ত গবেষণার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন,—"'দরাফ' দরিয়ার বন্যায় ভাসিয়া আসিয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে দরিয়ার বলিয়া ডাকিত", দরিয়ার শেষে দরাফ হয়।" দরাফ 'বিপ্র-বংশ-সম্ভূত', * * * কোতলপুরের প্রসিদ্ধ রায়-বংশে জন্ম", তিনি "দেশী সুরাও গোপনে ব্যবহার করিতেন।" দরাফ গো-শৃঙ্গ-লিপ্ত গঙ্গা-মৃত্তিকা-মাহাত্ম্য দেখিয়া

গঙ্গা-ভক্ত হইয়াছিলেন এবং “হৃদয়ের ভক্তি-ভরে প্রেম-গদ্‌গদ-কণ্ঠে স্তব করিয়া ফুল গঙ্গায় ভাসাইয়াছিলেন—ফুলগুলি স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই সলিল-মধ্য হইতে দুই খানি ছোট রাঙ্গা টুক্‌টুকে হস্ত টুপ্‌টুপ্‌ করিয়া ফুলগুলি জলের ভিতর টানিয়া” লইয়াছিল।

কেবল ইহাই নহে, দরাফ হিন্দুর ছেলে হইয়া মুসলমান হইলেন কেন ? গ্রন্থে তাহারও অপূর্ব্ব গবেষণা আছে। দরাফ মাতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলেন—“জন্মদোষে তুমি মুসলমান হইয়াছ।” দরাফের সন্দেহ হইল, তবে “মা কি আমার ব্যভিচারিণী ? তবে কি আমার জন্ম মুসলমান-ঔরসে ?” দরাফ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে মাতা বলিলেন,—“ঋতুর চতুর্থ দিবসে প্রত্যূষে দামোদরে স্নান করিতে গিয়া প্রথমেই এক জন মুসলমানকে দেখিয়াছিলাম।” ইহাতেই দরাফ বুঝিলেন,—“সহবাস-কালে মুসলমানের ভাব জননীর মনে উদিত হইয়াছিল, এবং তাহাতেই আমার জন্ম হইয়াছে বলিয়া আমি মুসলমান হইয়াছি।” ছি ছি ছি ! কি ঘৃণ্য—কি জঘন্য রুচির পরিচয় !!

গ্রন্থখানি নানা রত্নের আকর ! গ্রন্থে আবার গো-কোরবাণী লইয়াও নাড়া-চাড়া হইয়াছে। দরাফের পুত্র-কামনায় গো-কোর্‌বাণী মানত করা হয়। কিন্তু দরাফের বুদ্ধিমতী (?) স্ত্রী যুক্তি দেখাইয়া বলেন,—“গো-কোরবাণী আমরা যে করি, তাহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।” বটেই তো !! উহার মীমাংসার জন্য আবার “নবাব সরকারে আবেদন” করা হইল, “দিল্লীতে তখন সাজাহানের রাজত্ব ! সেখান হইতে * * * সংবাদ আসিল—“না—ঈদ-পর্ব্বে কেহ গো-কোরবাণী করিতে পারিবে না।” সাবাস গবেষণা !!

আর দেখাইব কত? বলি, উপন্যাস কি এইরূপেই লিখিতে হয়? বলিব কি, ইহাতে যেমন অপূর্ব্ব উদ্ভট কল্পনার সমাবেশ তেমনি ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য রক্ষা! কে না জানেন, জাফর খান, ঐতিহাসিক পুরুষ—দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহের শাসনকালে পাণ্ডুয়া বিজয়ার্থ ধর্ম্মবীর সৈয়দ শাহ্ সফিউদ্দীনের সঙ্গে এদেশে আগমন করেন? ইতিহাসে, পুস্তক-পত্রিকায় তাহার বিস্তর উল্লেখ আছে। এরূপ স্থলে 'তিনি হিন্দু—ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়াছিলেন গ্রন্থকার কোন্ সাহসে বলিলেন? আর সেই পাঠান-রাজত্বকালে মোগল-কুল-রত্ন বাদশাহ্ শাহ্‌জাহানই বা কেমন করিয়া আসিলেন? সুফী সাধক দরাফ খান মদ খাইতেন, সংস্কৃত জানিতেন, কে বলিল? বলি, এ কোন্ দরাফ?—এরূপ হেয়—নীচ—জঘন্য প্রকৃতির দরাফকে গ্রন্থকার কোথায় পাইলেন?

এ কথার উত্তরে হয় তো কেহ কেহ বলিবেন,—"ইহা যে উপন্যাস।" হউক, উপন্যাস, উপন্যাস-বর্ণিত নায়কের সহিত যখন ইতিহাসের সংশ্রব রহিয়াছে, তখন যা-তা লিখিয়া, বাজে-মার্কা কিম্বদন্তীর দোহাই দিয়া কি ইতিহাসের মর্য্যাদা নষ্ট—ঐতিহাসিক পুরুষের সম্ভ্রম নষ্ট করিতে হইবে? কোন্ মনস্বী ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিতে পারেন? ফলতঃ গ্রন্থকার 'দরাফ খাঁ' লিখিয়া এক জন ধর্ম্ম-প্রাণ তাপসের নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছেন—ইতিহাসের মর্য্যাদা-হানি করিয়াছেন এবং তৎসহ মুসলমান সমাজের অন্তরে ব্যথা প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতার নূর লাইব্রেরীর স্থাপয়িতা ও স্বত্বাধিকারী, আমার স্নেহভাজন সুধী যুবক ময়ীনউদ্দীন হোসায়ন, বি-এ 'দরাফ খাঁ' পাঠে মর্ম্মাহত হইয়া তেজস্বী তাপস জাফর খান গাজীর প্রকৃত জীবনী-সংশ্লিষ্ট এক খানি উপন্যাস রচনা করিয়া দিতে আমাকে

অনুরোধ করেন। আমি মহাত্মা জাফর খানের সম্বন্ধে পাণ্ডুয়া-বিজয়ী হজরত শাহ্ সফিউদ্দীনের সহযাত্রী ধর্ম্মপ্রাণ মখ্‌দুম কেয়ামউদ্দীনের বংশধর, পাণ্ডুয়ার অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু পরলোক-গত জনাব মৌলবী মহমুদনবী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অনেক কথা শুনিয়াছিলাম এবং পুস্তক-পত্রিকা পাঠেও বহু বিষয় অবগত ছিলাম। তাই সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এই গ্রন্থ প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের এ খানিও উপন্যাস, তবে ইতিহাসের সত্য সংশ্রবটুকু রক্ষা করিতে আমরা যত্ন করিয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বিধাতাই জানেন।

সাধারণ জনগণে মহাত্মা জাফর খান গাজীকে 'দরাফ খাঁ' এবং একটী লৌহ-দণ্ডকে 'দফ্‌রা গাজীর কুড়ুল,' বলিয়া থাকে। বিশেষ কারণে আমরাও এই উপন্যাসের "দরাফ খান গাজী" নামকরণ করিলাম। এতদ্দ্বারা সাধারণের ভুল ধারণার নিরসন সহ উপন্যাস-পাঠের সুখানুভূত হইলেই আমরা আনন্দিত হইব। ইতি

শান্তিপুর
আশ্বিন; ১৩২৬

বিনীত
মোজাম্মেল হক্

দরাফ খাঁ গাজী
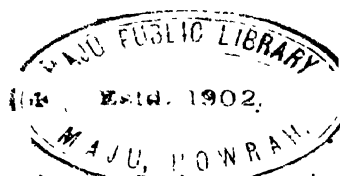
প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম-প্রচার-মন্ত্রণা

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। তখন মহামতি সুলতান ফিরোজ শাহ্ তোগলক দিল্লীর বাদশাহ্। দিল্লীর দুর্গশিরে ইস্লামের অর্দ্ধ-চন্দ্র-শোভিত গৌরব-পতাকা তখন পত্ পত্ রবে উড়িতেছিল। দিল্লীর চারিদিকে মোস্লেম-প্রভুতা দৃঢ়-রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু সুদূর বঙ্গদেশের অবস্থা তখন অন্যরূপ। বঙ্গের সকল অংশে তখনও মুসলমান-প্রভাব প্রবেশ লাভ করে নাই, ক্ষুদ্রায়তন অধিকার লইয়া অনেক স্থানেই অনেক হিন্দু-নরপতি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। পাণ্ডুয়া নগরীতে এইরূপ এক জন পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম পাণ্ডু। পাণ্ডুর মুসলমান-বিদ্বেষ অতিশয় প্রবল ছিল।

পাণ্ডু রাজার দরবারে পারসী ভাষায় অভিজ্ঞ এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান থাকিতেন। তিনি মহামান্য সৈয়দ বংশ-সম্ভূত। এই সৈয়দ সাহেবের কার্য্য, দিল্লীর দরবার হইতে সময়ে সময়ে পারসী ভাষায় লিখিত যে সমস্ত চিঠি-পত্র আসিত, তাহা পাঠ করা এবং তাহার জবাব লেখা। পাপিষ্ঠ পাণ্ডু রাজা সেই মনস্বী সৈয়দ সাহেবের একটী সদ্যোজাত শিশু-পুত্রের অন্যায়রূপে হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি নিরপরাধ শিশুর প্রাণ-

ভিক্ষা চাহিয়া কাকুতি-মিনতি করেন, কিন্তু তাঁহার ক্রন্দন-কাতরতায় পাষাণপ্রাণ পাণ্ডু রাজার হৃদয় গলে নাই,—নিষ্ঠুর পাণ্ডুর আদেশে নির্দ্দয় জল্লাদ পিতার কোল হইতে কোমল-প্রাণ পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়া পিতার সম্মুখে—পিতার চক্ষের উপরে তীক্ষ্ণধার তরবারি দ্বারা নির্দ্দয়রূপে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে! সেই নিদারুণ শোকের সংবাদ—অকারণে মুসলমানের উপর অসহনীয় নির্য্যাতন-কাহিনী দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে পৌঁছিলে সেই দুষ্ট-শাস্তা এবং শিষ্টের পালনকর্ত্তা মহামতি ফিরোজ শাহ্ স্বীয় ভাগিনেয় * ধর্ম্মবীর সৈয়দ শাহ্ সফিউদ্দীনের অধীনে চতুর্দ্দশ জন মোজাহেদ † সেনানী এবং বারো হাজার ধর্ম্মযোধ দুরাচার পাণ্ডু রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন জন্য পাণ্ডুয়ায় প্রেরণ করেন। পাণ্ডু রাজার দুষ্কৃতির বিষময় ফল হাতে হাতে ফলিল, ঘোরতর যুদ্ধে পাষণ্ড পাণ্ডু রাজা পরাজিত ও নিহত হইলেন। ‡

যুদ্ধ-জয়ী সুলতান শাহ্ সফিউদ্দীন এক্ষণে ধর্ম্মোন্মত্ত সৈন্য-সামন্ত লইয়া মহানন্দে নগরে প্রবেশ করিয়াছেন; পাণ্ডুর রাজতখ্ত্ ও ধন-ভাণ্ডার মুসমানদিগের হস্তগত হইয়াছে। পাণ্ডুয়ার রাজ-প্রাসাদে ও দুর্গশিরে ইস্লামের বিজয়-পতাকা সগৌরবে উড়িতেছে। নগরবাসীরা কতক পলায়িত, কতক ইস্লামের শান্তিপূর্ণ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। শাহ্ সফির

* কোন কোন গ্রন্থে ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে।
† যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করেন।
‡ গ্রন্থকারের 'পাণ্ডুয়া-কাহিনী' পাঠে সে বিষাদময় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

ব্যবস্থায় নগরে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান সৈন্য এবং অন্যান্য সহযাত্রীগণ তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে পাণ্ডুয়া নগরীর বিভিন্ন অংশে শিবির স্থাপন করিয়াছেন,—কেহ কেহ পলায়িত হিন্দুর শূন্য গৃহ অধিকার করিয়াছেন। হিন্দুর দেবার্চ্চনা, শঙ্খ-ঘণ্টার ঘন কোলাহল আর নগরে নাই, তাহার স্থলে ইস্‌লামের একেশ্বরবাদিতার মন্ত্র-ধ্বনি "আল্লাহো আক্‌বর" প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় ও রজনীতে মধুর উচ্চ-কণ্ঠে পঞ্চবার উত্থিত হইয়া নগরময় সুধা-ধারা বর্ষণ করিতেছে।

নগরের শৃঙ্খলা ও শান্তি-বিধান-কার্য্যে ধর্ম্মবীর শাহ্ সফি-উদ্দীন সাহেব কয়েক দিন বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। আজ তিনি নিশ্চিন্ত না হইলেও অনেকাংশে স্থির হইতে পারিয়াছেন। তাঁহার সহযাত্রী সেনানী ও সৈন্যগণের রণক্লান্তি ঘুচিয়াছে। তাই আজ তিনি ফুল্লমুখে সুবৃহৎ তাম্বুর তলে দরবার করিতে-ছেন। তিনি মধ্যস্থলে উপবিষ্ট—তেজোবীর্য্যভরা সুন্দর সুদীর্ঘ মূর্ত্তি! মাথায় সুফি-জন-সুলভ শুভ্র পাগড়ী, হস্তে তস্‌বীহ্, শুভ্র পোষাকে অঙ্গ আবৃত। তাঁহার বদন কোমলতাব্যঞ্জক, নয়নদ্বয় জ্যোতির্ম্ময়,—যেন দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র টল্‌মল্ টল্‌মল্ করিতেছে। তাঁহাকে ঘিরিয়া চতুর্দ্দশ জন মোজাহেদ সেনানী—সালার গাজী, শাহ্ নকৃশবী, শাহ্ জাফর খান্, মখ্‌দুম কেয়াম-উদ্দীন, সৈয়দ আশরাফ খান্ গাজী প্রভৃতি বসিয়াছেন। তাঁহাদের চারিদিকে অপর যোদ্ধগণ আসন গ্রহণ করিয়াছে। দরবারের শোভা উছলিয়া পড়িতেছে।

এস্থলে চতুর্দ্দশ জন মোজাহেদ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

ইহাঁরা বিভু-প্রেম-মাতোয়ারা ইস্‌লামের পরমভক্ত, সংসার-নির্লিপ্ত জিতেন্দ্রিয় দরবেশ; ইস্‌লাম-প্রচার ও নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণাই ইহাঁদের কার্য্য। স্বধর্ম্মে আঘাত লাগিলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও ইহাঁরা তাহার প্রতীকার করিতে অগ্রসর. পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজা মুসলমানের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করাতেই বাদশাহের ইচ্ছায় এই ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন।

দরবারে সকলেই নীরব। কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি ধর্ম্মবীর শাহ্ সফির মুখের দিকে। সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল; সেই সত্যের সাধক পাণ্ডুয়া-বিজয়ী মহাবীর সকলকে হাস্যমুখে কহিলেন,—"দয়াময় আল্লার কৃপায় আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে,—পাণ্ডুয়া জয় হইয়াছে, দুরাচার পাণ্ডু রাজা তাহার কুকার্য্যের জন্য উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে। এই বিজয়-ব্যাপারের মূল আপনারাই। আপনাদেরই সাহসে, আপনাদেরই বাহু-বলে এই ভীষণ যুদ্ধে আমরা জয়ী হইয়াছি। আমি আপনাদের এই বীরত্বের—বল-বিক্রমের কথা দিল্লীতে মহামান্য বাদশাহের গোচর করিব। এখন একটী কথা,—এই বিজয়ের আমোদে মাতিয়াই আমা-দিগকে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না, কেবল এই একটী বিজয়-কার্য্যেই যে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল, ইহা আমার মনে লইতেছে না। আল্লাহ্-তা'লা যেন আরো কিছু করাইবার জন্য আমার অন্তরে আঘাত করিতেছেন।"

ইহা বলিয়া ধর্ম্মবীর নীরব হইলেন। ইত্যবসরে শাহ্ সালার গাজী ও মখ্‌দুম কেয়ামুদ্দীন উন্নতমুখে বলিলেন,—"আল্লার কাজে—ধর্ম্মপথে প্রাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

তুচ্ছ সংসার-সুখ অনিত্য, নিত্য সুখের কে না আশা করে? অতএব বলুন, আমাদেব আব কি করিতে হইবে। অতি কঠিন হইলেও আমবা তাহাতে উন্মত্ত পতঙ্গ-পতনের মত ঝাঁপ দিয়া পড়িব।"

ইহা শুনিয়া শাহ্ সফিউদ্দীনেব মুখ বিজলীব উজ্জ্বল প্রভায় উজ্জ্বল হইযা উঠিল, অন্তব আনন্দে ভবিয়া গেল। ঊর্দ্ধদিকে হাত তুলিযা গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—"হাজার ধন্যবাদ সেই আল্লাহ্-তা'লাকে যে, আপনাদেব ন্যায় মহাপ্রাণ পুরুষদেব সাথে এই সুদূর বঙ্গদেশে—হিন্দুব মুলুকে আসিয়াও বড়ই আমোদ পাইতেছি। এখন শুনুন, আমাব কথা কি। আমার কথা আব কিছুই নয়—আল্লার মহিমা জাবি আব ইসলাম প্রচাব করা। এ মুলুকটা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মে মাতোয়াবা, অধিবাসীরা সত্য সোজা পথ ছাড়িয়া বিপথে পড়িয়াছে—খোদা-তা'লাব অংশী—মূর্ত্তি বানাইয়া তাহারই ধ্যানে মজিযাছে। তাহাদেব এ ভ্রম ঘুচাইতে হইবে, পাপে মগ্ন আওবত-মর্দ্দকে সিধা পথ দেখাইতে হইবে। ঠাঁই ঠাঁই মসজিদ-মিনাব বানাইয়া আল্লার এবাদৎ—আল্লাব আরাধনা শিখাইতে হইবে। আমি এই পাণ্ডুয়াতেই সেই শুভ কার্য্যের জন্য—আল্লার বান্দাকে আল্লাব নাম লওয়াবাব জন্য—তাহাদিগকে নামাজে দাখেল কবিবার জন্য একটী মসজিদ, একটী মিনার আর দীঘি-তালাব বানাইতে ইচ্ছা করি।"

এই কথায় ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ 'আল্লা' 'আল্লা'রবে আনন্দে কোলাহল কবিয়া উঠিলেন। সকলেই "জল্‌দী এ শুভ কাজের আঞ্জাম হউক" বলিয়া প্রস্তাব অনুমোদন কবিলেন। এই

আনন্দে নানা কথায় কিছুক্ষণ কাটিল। পরে সৈয়দ আশ্‌রাফ খান্‌ গাজী কহিলেন—"বহু মুসলমানের প্রাণের বদলে—বহু রক্তপাতে আমরা পাণ্ডুয়া দখল করিয়াছি। এই বিজয়-ব্যাপার স্মরণ জন্য মসজিদ-মিনার যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা এই পাণ্ডুয়াতেই বিশেষ আয়োজনে করা হউক। কিন্তু এ দেশের আর আর জায়গায় কিরূপে ইসলাম-জারি করিতে হইবে, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না?"

ইহা শুনিয়া দরবেশ শাহ্ সফি সাহেব বলিলেন—"আপনারা আমাদের পবিত্র ধর্ম্মগুরু হজরত রসুলে-করিমের (দঃ) কথা মনে করুন। ইস্‌লাম-জারির জন্য তিনি কত কষ্ট পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কাফেরদিগকে ডাকিয়া ইস্‌লামের কথা শুনাইতেন, তাহাতে লোক ক্রোধের বশে তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইলে, তিনি সদলবলে—কেবল আত্মরক্ষার কারণে, তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। আমাদেরও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আপনারা এক এক জন এক এক দল সঙ্গী লইয়া বা একেলা ফকিরবেশে দিগে দিগে ইস্‌লাম-প্রচারে বাহির হউন; আমি এই পাণ্ডুয়াতে মস্‌জিদ-মিনার বানাইতে আর আশে-পাশে ইস্‌লাম-জারি করিতে রহিলাম। খোদা না করুন, যদি দরকার হয়, তবে আপনাদের আত্মরক্ষার্থ এই সব সৈন্য পাঠাইয়া দিয়া আমি আপনাদের সাহায্য করিব।"

"ফকির-বেশে ইস্‌লাম-জারি করাই আমি পসন্দ করি। তবে আপনার সাবধানের জন্য সশস্ত্র সঙ্গী যদি কেহ লইতে চান, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, যিনি যাহা পসন্দ করেন, তিনি

তাহাই করুন।” ইহা বলিয়া দরবেশ শাহ্ নকৃশবী সাহেব আপনার মত প্রকাশ করিলেন।

সভা আবার স্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। এ পর্য্যন্ত মহাত্মা জাফর খান্ গাজী একটী কথাও বলেন নাই। তিনি দরবেশ শাহ্ সফিউদ্দীনের নিকট সম্পর্কীয় লোক—ভাগিনেয়। তাঁহার চেহারা যেমন সুন্দর, তাঁহার অন্তরও তেমনি সদ্‌গুণরাশিতে ভরা; তাঁহার দেহ যেমন দীর্ঘ, তাঁহার শক্তি-সামর্থ্যও তেমনি অমিত। তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্মানুরাগী মহাপুরুষ। তিনি ধর্ম্ম-পথের প্রকৃত নেতা মহাজ্ঞানী মাতুল সৈয়দ শাহ্ সফিউদ্দীনের সতত সঙ্গ লাভ করেন, ইহাই তাঁহার বাসনা। তাই দূর-দূরান্তে গিয়া ইস্‌লাম-প্রচারের কথা শুনিয়া তিনি মাতুলকে বলিলেন,—“ইস্‌লাম-প্রচার ও তাহার উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু একটী কথা,—যে সব আত্মীয় ও অনুগত লোক আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহারা আমার সঙ্গেই থাকিতে ইচ্ছা করেন, আর আমারো ইচ্ছা, আমি সততই আপনার সঙ্গ লাভ করি। কেননা আমার ধর্ম্মজীবন আপনার সহবাসেই অধিক স্ফূর্ত্তি লাভ করে—আমি আপনার কাছে অনেক বিষয় শিখিতে আশা করি। তাই আমার প্রচার-ক্ষেত্র দূরে না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।”

শাহ্ সফি হাস্যমুখে বলিলেন,—“জাফর, তোমার কথা শুনিয়া আমি বড়ই খুশী হইলাম। কিন্তু দূরে যাওয়ার কথায় তোমার মনে ভয় হয় নাই তো?”

"ভয় ? আল্লার কাজে ভয় কি মামুজি ? হুকুম করুন, সদা-সর্ব্বদাই এ গোলাম আপনার হুকুমের তাবেদার। আপনার হুকুম হইলে সাত সমুদ্র, তের নদীর পারে যাইতেও গোলাম পশ্চাৎপদ হইবে না।"

শাহ্ সফিউদ্দীন পুনঃ হাস্যমুখে বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি নিকটেই থাক, নিকটে কোন ঠাঁই থাকিয়াই ইস্‌লাম-প্রচার কর। খোদাব কাজ হইলেই হইল।"

তখন অপর সকলেও শাহ্ সফির কথায় সায় পূরিলেন!

ইস্‌লাম-প্রচার-মন্ত্রণা সাঙ্গ হইল, সভাও ভঙ্গ হইল। অতঃপর কয়েক দিবসের মধ্যেই এই চতুর্দ্দশ জন মহাসাধক, দরবেশ শাহ্ সফির নিকটে বিদায় লইয়া আল্লাব নাম জপিতে জপিতে বঙ্গদেশেব স্থানে স্থানে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পাঠকগণ! এ পর্য্যন্ত যাহা অবগত হইলেন, তাহা এ গ্রন্থেব সূচনা ভিন্ন আব কিছুই নহে। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ হইতেই আমাদেব আখ্যায়িকাব আরম্ভ। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ জন পুণ্য-পুরুষেব মধ্যে অন্যতম সাধক মহাত্মা জাফর খান্ গাজীর প্রকৃত জীবনী-কথার সহিত অন্য ঘটনা এখন হইতে আপনাদের গোচর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ত্রিবেণী তীর্থ

ত্রিবেণী অতি মনোরম স্থান। ইহার শোভা-সমৃদ্ধির সীমা নাই। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, এই নদীত্রয় বিশাল কায়া বিস্তার করিয়া কল-কল-নিনাদে ত্রিবেণীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নদী-বক্ষে শত শত বাণিজ্য-তরী পণ্য-ভার লইয়া সপ্তগ্রামের বন্দরে গতাগতি করিতেছে। নিশাগমে এই সকল তরী আলোক-মালায় সজ্জিত হইয়া অধিকতর শোভা ও সুখদায়ক হয়। তরণী তরঙ্গের তালে তালে নাচিতে থাকে, সেই তালের সহিত তান ধরিয়া মাঝি-মাল্লা ও আরোহীরা নগর-বাসীদের কর্ণে মাধুরী বর্ষণ করে।

ত্রিবেণী হিন্দুর মহাতীর্থ। একে তীর্থস্থান, তাহাতে আবার তৎকালের রাজকীয় বন্দর সপ্তগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বলিয়া বাণিজ্য উপলক্ষেও এখানে নানা শ্রেণীর হিন্দুর বসবাস হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন রাঢ়-চোয়াড় অর্থাৎ হাড়ী, বাগ্‌দী, বাউরী, ডুলে প্রভৃতি অনেক ছিল। এই সকল লোকের কল-কোলাহলে ত্রিবেণী নিয়তই গুলজার থাকিত। বিশেষতঃ কোন পার-পার্ব্বণ উপলক্ষে বহু হিন্দু তাহাদের পাপ-তাপ-নাশিনী গঙ্গা-মাতার দর্শন ও পূজার জন্য দূর-দূরান্ত হইতে আসিয়া নগর আরো গুলজার করিয়া তুলিত।

ত্রিবেণীর গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে, নগরের কিঞ্চিৎ

তফাতে শ্যাম দূর্ব্বাদল-সমাচ্ছন্ন এক খণ্ড বিস্তীর্ণ ভূমি। দুই তিনটী অশ্বথবৃক্ষ ভূমির উপর ছায়া দান করিতেছে। এই ভূখণ্ড যেমন মনোরম, তেম্নি সুখ-শান্তির আলয়। প্রকৃতি যেন কি এক মাধুরী এখানে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। তাই এখানে আসিলেই নর-নারীর প্রাণে কি এক উল্লাস—কি এক ঐশিক প্রেম-ভক্তির ভাব আপনিই উথলিয়া উঠে; বোধ হয় যেন নির্ম্মল আনন্দ ও পবিত্রতা এখানে সততই বিরাজ করে।

বহু সংসার-বিরাগী কৌপীনধারী উদাসীন ব্রহ্মচারী ও সাধু-সন্ন্যাসী এই ভূখণ্ডের অশ্বথ-তরু-তলের নিত্য অধিবাসী। তাঁহাদের লক্ষ্য মোক্ষের দিকে। হিন্দুর পাপ-তাপহারিণী কলুষ-নাশিনী গঙ্গাদেবীর উপাসনায় ও দর্শনে মুক্তিলাভ করিবে, ইহাই তাঁহাদের আশা—ইহাই তাঁহাদের ধারণা! তাঁহাদের কামনা অতি উচ্চ—অতি মহান্, কিন্তু কার্য্যটা ফলদায়ক কি না, কে জানে?

প্রাতঃকাল। তরুণ তপনের রজত-কিরণ গাছের পাতায়, গৃহের চূড়ায়, দূর্ব্বাদলে, ফুল-ফলে এবং গঙ্গা-সরস্বতীর জলে পড়িয়া চিক্-মিক্ চিক্-মিক্ করিতেছে। জলরাশি নবরাগে রঞ্জিত হইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে। বাতাস কোন্ মালঞ্চের কত কুসুম-সৌরভ বহিয়া আনিয়া অযাচিতভাবে লোকের নাসিকার তৃপ্তি সাধন করিতেছে—শরীর জুড়াইয়া দিতেছে। পৃথিবীর এই সময়টার দৃশ্য অতি সুন্দর, অতি মনোরম ও অতুলনীয়! এ সময় যে আনন্দ, যে স্ফূর্ত্তি, যে ভাবময় অনুভূতি হৃদয় অধিকার করে, পৃথিবীর তাবত ধন-রত্ন দিলেও তাহা পাওয়া যাইতে পারে না।

ঠিক এই সময়ে তিনটী মনুষ্য-মূর্ত্তি সন্ন্যাসীগণের সাধন-ভূমির অদূরে উপস্থিত। এই ব্যক্তিত্রয়ের মধ্যে এক জন এদেশের ন্যায় বেশ-বিন্যাসধারী—সামান্য শাদা ধুতি-পরা, গায় উড়ানী। ইহাঁর মুখমণ্ডল দাড়ী-গুম্ফহীন এবং মস্তকের কেশও ছোট। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ পার করিয়াছেন। দেখিতে সুন্দর—গৌর বর্ণ! নাসিকা উন্নত, চক্ষু তেজোময়, ললাট প্রশস্ত ও জ্ঞান-গরিমা-ব্যঞ্জক। অপর দুই জন প্রায় সমবেশধারী,—কটিদেশে পায়জামা আঁটা, উর্দ্ধাঙ্গ দীর্ঘ আঙরাখায় ঢাকা। পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যে এক জনের মস্তকে সুদৃশ্য পাগড়ী, হস্তে তস্‌বীহ্‌, মুখে দীর্ঘ ঘন দাড়ী এবং অন্যের মস্তকে কেবল একটী শোভন টুপী! পাগড়ী-ধারীর বয়স পঁয়ত্রিশের উপর, বদনমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময়, চক্ষু দুটী প্রভাতের তারার ন্যায় দব্‌দব্‌ দব্‌ দব্‌ করিতেছে। তাঁহার সঙ্গী অনুমান পঁচিশ বৎসর-বয়স্ক হইবেন। ইহাঁর মুখ-মণ্ডল অল্প অল্প দাড়ীতে শোভিত। উভয়েই সুন্দর—সুগঠিত, দেখিলেই যেন বলিষ্ঠ, তেজস্বী, অথচ ধীরবুদ্ধি বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা এদিক-ওদিক কয়েক পদ চলা-ফেরা করিয়া এক স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। অমনি এদেশের ন্যায় বেশধারী ব্যক্তি হঠাৎ গঙ্গার দিকে চাহিয়া যুক্তকরে উচ্চকণ্ঠে দ্রুত উচ্চারণ করিতে লাগিলেন :—

"যত্ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ
যস্মিন্ পান্থ দৃগন্ত সন্নিপতিতৈ র্যৈঃ স্বর্য্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্কে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো সুশ্রীয়সে পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণা-পরায়ণ-পরা মাতাসি ভাগীরথি!

অচ্যুত-চরণ-তরঙ্গিণী, শশি-শেখর-মৌলী-মালতী-মালে,
ত্বয়ি তনু-বিতরণ সময়ে হরতা দেয়া ন মে হরিতা।
শূন্যীভূতা শমন-নগরী নীরবা রৌরবাখ্যা
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিনমহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ।
ত্বমস্তো লোকানামখিল-দুরিতান্যেব দহসি,
প্রগন্ত্রী নিম্নানামপি, নয়সি সর্ব্বোপরিন্ তান্।
স্বয়ংজাতা বিষ্ণোর্জ্জনয়সি মুরারাতি নিবহা,
নহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে!
সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তম্,
স তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিম্‌তে মহত্ত্বম্!
যদিচ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপীনম্ মাং,
তদিহ তব মহত্ত্বম্ তন্মহত্ত্বম্ মহত্ত্বম্!”

অন্য দুই জন আগন্তুক বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে স্তোত্র-পাঠকের দিকে চাহিয়া তাঁহার ভাব-ভঙ্গী দেখিতে ও পাঠ শুনিতে লাগিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইল, পাঠক মুখ নত করিলেন।

এক জন বলিলেন,—“শর্ম্মা ঠাকুর! এ আবার কি? এ কি বলিলেন?”

“ইহা গঙ্গাদেবীর স্তব—গঙ্গার বন্দনা! গঙ্গা হিন্দুর দেবতা, গঙ্গার জলে হিন্দুর পাপ-তাপ ধুয়ে যায়। গঙ্গায় ভক্তিভরে নাইলে, গঙ্গার কূলে মরিলে হিন্দু পরকালে ভেস্তে যায়! তাই হিন্দুর কাছে গঙ্গার মহিমার সীমা নাই।”

“সে কি শর্ম্মা ঠাকুর—সে কি! দরিয়ায় নাইলেই কি বেহেশ্‌তে যাওয়া যায়! একি পাগলের কথা নয়? বেহেশ্‌তে

দেওয়ার মালিক খোদা-তা'লা, খোদা ভিন্ন সে ক্ষমতা আর কাহারো নাই। খোদার এবাদৎ-আরাধনা করিলেই সে কাজ হইতে পারে, নতুবা হয় না। কিন্তু তোমাদের হিন্দুর কি মস্ত ভুল—কি ধাঁদা! অতি আহাম্মক লোকেও তো এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারে না! শর্ম্মা ঠাকুর, তুমিও কি এখনো ও-কথা বিশ্বাস করো?

"না, তা করি না; প্রথম জীবনে করেছি, তার পরে আর কোন কালেও করি নাই! তার পরে আমি এক ব্রহ্ম—এক আল্লারই উপাসক, এক জগদীশ্বর—আল্লাই মুক্তিদাতা আমি জানি।

"তদ্বিপ্রাসো বিপন্যু বো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।" (ঋগ্বেদ)

নিষ্কাম জাগ্রৎ ব্রাহ্মণেরা সেই সর্ব্বব্যাপী আল্লারই (পরম পদের) উপাসনা করেন, বেদ হইতে ইহা জানি এবং জানি

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং"

যে ব্রহ্মকে (আল্লাকে) জানে, সেই ব্রহ্মপদ পায়, ভেস্তে যায়। আমি চিরদিন তাই নিরাকার আল্লারই উপাসনা করিয়া আসিয়াছি।"

"তবে ঠাকুর! আজ ও-কথা মুখে কেন?"

"ইহা অভ্যাসের ফল ও লোকাচার। বিশেষ এই স্তবটী আমার গুরুদেবের রচিত, গুরুদেব আমাকে শিখাইয়াছিলেন। স্তবটী আমার খুব প্রিয়। ইহা পড়িয়া আমি গঙ্গার স্তব করিতাম। ইহার রচনা যেমন সুন্দর, ভাবও তেমনি মধুর। তাই

আমি যখন-তখন পড়ি—পড়িতে ভালবাসি। অভ্যাস-বশে এখনো পড়িয়া ফেলিয়াছি। অভ্যাস কি সহজে যায়? জানিবেন, অভ্যাসের বশেই আমার হিন্দুয়ানী আচার-ব্যাভার কিছু দিন অল্প-বিস্তর থাকিবে।"

এই সময়ে তৃতীয় আগন্তুক মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর! বাইরে যাই কর, ভিতরটা কিন্তু যেন সাফ—খোলাসা থাকে।"

"তা কি আর বল্‌তে হবে? আমি ঠিক আছি, জানবেন।"

"বেশ—বেশ" শব্দ উচ্চারণের সঙ্গেই সকলের কথা সাঙ্গ হইল। সকলে নীরবে দাঁড়াইয়া সেই মনোরম স্থানের প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে গঙ্গার স্তুতি-পাঠ কোন কোন সন্ন্যাসীর কাণে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাঁহারাও পাঠকের মধুর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া ধ্যান-মগ্নাবস্থাতেই উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে—"আহা এ কোন্ ভক্তের কণ্ঠস্বর! এমন স্তব তো কখন শুনি নাই!" ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া ধ্যান-মগ্ন নয়ন তুলিয়া চাহিলেন। কি আশ্চর্য্য! সে নয়ন আর ফিরে না, নয়নে পলকও পড়ে না। সন্ন্যাসীদের মনের গতি অন্য দিকে দৌড়িল। আগন্তুকদের দুই জনের পোষাক-পরিচ্ছদ ও চেহারা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। এই বঙ্গদেশের কত নগর-নগরী-পল্লী, কত হাট-বাজারে ভ্রমণ করিয়াছেন, এই ত্রিবেণী তীর্থেও হাজার হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ অপূর্ব্ব পোষাক কাহারও কখন তাঁহারা দেখেন নাই। এদেশের লোকের অঙ্গ-

আবরণ এক খানি ধুতি, আর গায় দেয় মাত্র এক খানি উড়ানী! কিন্তু এদের গায় এ কি সুন্দর পোষাক! এদের চেহারাও কি দেবতুল্য শান্ত, সুন্দর ও গম্ভীর। এরা দেবতা নাকি? কি সুন্দর দাড়ী, কি দীর্ঘ নাসা, আর কি দুইটী সদ্ভাবপূর্ণ এদের উজ্জ্বল নয়ন! সন্ন্যাসীরা ক্ষণকাল অনন্যমনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন।

তখন শর্ম্মা ঠাকুর অপর দুই জনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, আর অন্য আগন্তুকদ্বয় দেখিতেছেন আর হাসিতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন—প্রত্যেক সন্ন্যাসীর সম্মুখে অগ্নি-কুণ্ড। অগ্নি জ্বলিতেছে—স্থানটী অগ্নি ও ধূমময় হইয়া গিয়াছে। কোন সন্ন্যাসী মুদিত-নয়নে ধ্যানমগ্ন, কোন সন্ন্যাসী উচ্চকণ্ঠে ধর্ম্মপুস্তক পাঠে ব্যস্ত, কোন সন্ন্যাসী বেদীতে বসিয়া 'বো-ম' 'বো-ম' শব্দে গাল বাজাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন, কেহ বা লম্বা চিমটা দ্বারা আগুন উজ্জ্বল করিয়া দিতেছেন। কেহ ভস্মে অঙ্গ ঢাকিয়া ঢুলু-ঢুলু নয়নে গঞ্জিকা দেবীর সেবা করিতেছেন। কোন মহাত্মা মস্তকে এক বোঝা জটা লইয়া হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা এবং কোমরে মোটা দড়া জড়াইয়া খাড়া হইয়া আড়-নয়নে সূর্য্যের দিকে চাহিতেছেন! অনেকের সম্মুখে পিত্তলের আসনে বহু ছোট ছোট দেব-দেবীর মূর্ত্তি—সন্ন্যাসীরা তদুপরি গঙ্গাজলের ছিটা ও ফুল-বিল্বদল দিয়া পূজা করিতেছেন। তীর্থবাসী নর-নারী ও ভক্ত নগরবাসীরা দেবপূজা ও সন্ন্যাসীদের সেবার জন্য ফুল-ফল ও মিষ্টান্নাদি আনিয়া হাজির—কেহ প্রণাম করিয়া যুক্তকরে দণ্ডায়মান, কেহ

গমনোদ্যত, কেহ বা পুত্র-কন্যার কুশল জন্য সাধুর চরণ-বন্দনা করিতেছে।

অন্যদিকে কিয়দ্দূরে নদীর জলে আর এক দৃশ্য। হাজার হাজার নর-নারী—নবীন-প্রবীণ, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা—কেহ ডুব দিতেছে, কেহ গা মাজিতেছে, কেহ কাপড় কাচিতেছে। কত জন বুকের উপর গামছায় হাত ঢাকিয়া বিড় বিড় করিয়া মনে মনে কি বলিতেছে, কত জনে হাতে অথবা তামার কোষা-কুশীতে জল তুলিতেছে আর ফেলিতেছে। আবার কত স্ত্রীলোক ঘাটের ধারে কাদার শিবলিঙ্গ বানাইয়া ফুল-বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিতেছে। স্ত্রী-পুরুষে মাখা-মাখি—ঘেঁষা-ঘেঁষি, লজ্জা নাই, শরম নাই। অম্লানবদনে গঙ্গার জলে নধর ললিত নগ্নদেহ ডুবাইয়া নারীর দল অসঙ্কোচে গামছার ব্যবহার করিতেছে। কেবল কোন কোন যুবতী-বধূ ঘোমটার ভিতর মুখ লুকাইয়া, সন্তর্পণে স্নানের কাজ সারিয়া, কলসী-কক্ষে গৃহমুখী হইতেছেন।

আগন্তুকদ্বয় এ দৃশ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না—বরং অতীব বিরক্ত ও অনুতপ্ত হইলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"শর্ম্মা ঠাকুর! এই কি হিন্দুর ধর্ম্ম? এই কি সভ্যতা—শিষ্টাচার? এ-দেশের আওরতরা খুবসুরত বটে, কিন্তু এত বেপর্দ্দা! এত বেহায়া!! বেপর্দ্দা হলে কি আওরতের ইজ্জৎ থাকে? হায়, আল্লাহ্-তা'লা কবে এদের মতি-গতি ফেরাবেন! আচ্ছা, বল তো ঠাকুর! এই যে ল্যাংটা জটাধারীর দল মা-বাপের খেদমৎ ছেড়ে, ঘর-সংসার ছেড়ে এখানে

আছে, এরা কি ধর্ম্ম মেনে চল্‌চে ? এতে কি এদের ধর্ম্ম হচ্চে ?"

এই কথা শুনিয়া শর্ম্মা ঠাকুর ঈষৎ হাসিলেন, মনে মনে বলিলেন :—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ ॥"

"পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, তপ-জপ সমস্তই পিতা। পিতাকে সন্তুষ্ট করিলেই সব দেবতাকেই সন্তুষ্ট করা হয়। মাতা আবার পিতার অপেক্ষা গরীয়সী ! সুতরাং পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করিলে—পিতা-মাতার সেবা ত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হয় না, বরং পাপ হয়, গাজী সাহেব ঠিক বলিয়াছেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"ধর্ম্ম হয় না, ঠিক কথা, কিন্তু পতিতপাবনী গঙ্গার কৃপা হলে সব পাপ যে ধুয়ে মুছে যায়। এই বিশ্বাসেই হিন্দুর কাছে গঙ্গার এত ভক্তি—হিন্দু গঙ্গা-জলকে অতি পবিত্র মনে করে।"

গাজী সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"একি ঠাকুর, আবার সেই দেওয়ানার মত বে-ওকুফী কথা !"

ঠাকুর। না, তা বলচিনে—হিন্দুর ইহাই বিশ্বাস।"

রেখে দাও হিন্দুর ও-বিশ্বাস। এখন একটী কথা,—এই জায়গাটা বড় খুবসুরত—বড় বাহারদার ! আমার খুব-ই পসন্দ হয়েছে। এখানে এসে আমার মনে খোদার প্রতি প্রেম-ভক্তি শতধারে ব'য়ে যাচ্চে। অন্তরে কি যেন একটা উচ্চ—কি যেন একটা পবিত্র—মধুর ভাব জেগে উঠেছে। সেই দীন-দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্-তা'লার এবাদৎ-আরাধনার এটী

উপযুক্ত জায়গা! আমি এ জায়গাটা দখল্ ক'রে মস্‌জিদ বানাতে ইচ্ছে করি।"

গাজী সাহেব ইহা বলিয়া শর্ম্মা ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিলেন।

ঠাকুর বলিলেন,—"ইঁহারা গঙ্গা-ভক্ত—গঙ্গাব দর্শন পাওয়ার জন্যই রাত-দিন তপ-জপ করিতেছেন, গঙ্গার দেখা পাইলে আপনিই চলিয়া যাইবেন। এখন জোব করিয়া তো......"

গাজী সাহেব ঠাকুরের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"আরে গঙ্গা তো ঐ সামনে, ঐ তো গঙ্গা দেখ্‌চে—কত দিন ধরে দেখ্‌চে। এতেও কি ওদের গঙ্গা-দেখা হয়নি।"

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—"না হুজুর, ও দেখা, দেখা নয়। সে-দেখা, গঙ্গাব আসল মূর্ত্তি দেখা। ফলে গঙ্গার মূর্ত্তি থাকুক আর নাই থাকুক, হিন্দু তাহা আছে বলিয়া বিশ্বাস কবে, কিন্তু কেহ কখন সে মূর্ত্তি দেখে নাই।"

"তবে এরাও কখন সে মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে না।"

গাজী সাহেবের এই কথায় শর্ম্মা ঠাকুব উত্তর করিলেন না।

"তবে তো এই ল্যাংটার দল এ জায়গাটার দখল ছাড়বে না! এদের হয় ইস্‌লামে আনা, না হয় ধন-দৌলত দিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে জায়গা-ছাড়া করতে হবে।"

গাজী সাহেবের এই কথা শুনিয়া ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"উহু্ তা কি হতে পারে? ইস্‌লামে আনা তো ঘটবেই না, তা ছাড়া ধন-দৌলতে বশ ক'রে এই সন্ন্যাসীর দলকে তাড়ানও সহজ কথা নয়। তা হলে এদেশের রাজা-রাজড়া

আর সাধারণ লোক চট্‌বে,—ক্ষেপে উঠে আমাদের দুষ্‌মন্‌ হয়ে দাঁড়াবে।"

ইহা শুনিয়া স্বয়ং গাজী সাহেব এবং অন্য আগন্তুক গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"লোকে দুষ্‌মন্‌ হবে? কেন হবে? আর যদি বিনা কারণে দুষ্‌মনই হয়, তাতেই কি আমরা ডরাই? আল্লার দয়া হলে হেলায় সে সব দুষ্‌মন জের হয়ে যাবে। তবে জেন, আমরা নিরস্ত্র, বিবস্ত্র, বেহায়া সাধুদের উপর জোর-জবরদস্তি করতে চাইনে। আল্লার কাজ আল্লাই করবেন, আল্লার কৃপায় এ জায়গা জলদী আমাদের দখলে আস্‌বে। এখন তাঁবুতে চল, পরে যা হয়, হবে।"

ইহা বলিয়া আগন্তুকত্রয় ধীর পদবিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

এস্থলে এই আগন্তুকদের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। গাজী সাহেব আর কেহই নহেন,—সেই পাণ্ডুয়া-বিজয়ী মহাসাধু সৈয়দ শাহ্‌ সফিউদ্দীনের সহযোগী এবং তাঁহার ভাগিনেয়—দরবেশ জাফর খান গাজী। তিনি ইস্‌লাম প্রচার জন্য ত্রিবেণীতে আসিয়া একটী ময়দানে তাম্বু ফেলিয়া অবস্থান করিতেছেন। সঙ্গে শতাধিক ধর্ম্মযোধ এবং অন্তরঙ্গ ব্যক্তি, ইহা ছাড়া চাকর-বাকরও আসিয়াছে। আর আসিয়াছে ঘোড়া, গাধা ও উট-বোঝাই খাদ্য-সামগ্রী। আর যিনি তাঁহার সহিত সমস্বরে কথা কহিলেন, তিনি গাজী সাহেবের জনৈক প্রিয় সহচর, নাম মোস্তফা খান বোখারী। মোস্তফা খান উচ্চ বংশীয় সুগঠিত সুন্দর যুবক এবং তেজো-বীর্য্যের আধার ছিলেন।

শর্ম্মা ঠাকুরের পূর্ণ নাম সোমেশ্বরাচার্য্য, শর্ম্মা ঠাকুর বলিয়াই

আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট পরিচিত। সোমেশ্বর পাণ্ডুয়ার এক জন খ্যাতনামা হিন্দুশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত। তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞান, বিচার-শক্তি ও পাণ্ডিত্যের নিকট অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতকেও হার মানিতে হইত। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন—নানা দেব-দেবীর প্রকাশ্য পূজায় তাঁহার বড় একটা আস্থা-ভক্তি ছিল না। পাণ্ডুয়া-বিজয়ের পরে শাহ্ সফিউদ্দীনের কাছে তিনি সপরিবারে ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন। শাহ্ সফি সোমেশ্বর শর্ম্মাকে সমশের শর্ম্মা বলিয়া ডাকিতেন; অপর সাধারণে শর্ম্মা ঠাকুরই বলিত।

যখন জাফর খান গাজী ইস্‌লাম-প্রচার জন্য শাহ্ সফিউদ্দীনের নিকটে বিদায় লইয়া আসেন, ভাগিনেয়ের তত্ত্বাবধান জন্য তিনি সমশের শর্ম্মাকে মন্ত্রীস্বরূপ গাজী সাহেবের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। শাহ্ সফি ভাগিনেয় জাফর খানকে বড়ই স্নেহ করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লীলাবতী কে ?

লীলাবতী রূপসী, লীলাবতী চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া সুন্দরী ; দেখিলেই মনে হয়, বালিকা যেন একটী স্বর্গের পরী। এই তরুণ বয়সে যৌবনের উন্মেষকালে কুসুম-কোমলা নারী-দেহ যে মধুরতা, যে লালিত্য, যে মনঃপ্রাণ-মাতানো ভাবে ভরিয়া উঠে, জগতে তাহার তুলনা তো খুঁজিয়া পাই না! লীলাবতী একে বয়সের গুণে সেই সুখময় অবস্থায় উপনীত, তাহাতে আবার তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—সৌষ্ঠবময়, রূপসীর রূপ যেন ঝলক মারিয়া ঠিকরিয়া পড়িতেছে। বালিকার মুখখানি শোভন—সুন্দর—সরলতাপূর্ণ, নাসিকা উন্নত—সরল, ওষ্ঠ চিক্কণ ; চক্ষু দুটী যেন শান্ত সরোবরে নীল পদ্মের ন্যায় ঢল্-ঢল্ করিতেছে। নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া নধর নিতম্ব চুম্বন করিতেছে। ফলতঃ তাহার সর্ব্বাবয়ব নিটোল—কোমল, কিন্তু এখনও তাদৃশ পুষ্টতা প্রাপ্ত হয় নাই। সবেমাত্র যৌবনের বিকাশ বা অর্দ্ধ-বিকাশকাল, নব অনুরাগ-রঞ্জিত আলোকে ধরণীর শোভা বাড়াইবার জন্য প্রমোদিনী উষা প্রভাতে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, লীলাবতী নিরাভরণা! গহনা নামে যে সকল জিনিস রমণীরা পরিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া

থাকেন—কেহ কেহ অহঙ্কারে মাটীতে পা দেন না, লীলাবতীর অঙ্গে তাহার কিছুই নাই, কেবল দুই গাছি শাঁখার বালা তাঁহার সুগোল সুন্দর প্রকোষ্ঠদ্বয় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ছার—তুচ্ছ সে সব গহনা! যাহাদের রূপ নাই, লাবণ্য নাই, কোমলত্ব—মাধুর্য্য নাই, তাহারাই নিজ দেহের শোভা-সৌন্দর্য্য বাড়াক। যাহার রূপ আছে, তাহার গহনার প্রয়োজন? শোভার আধার পূর্ণচন্দ্রের উপরে কি চুম্‌কী বসান সাজে?

লীলাবতী গণপতি মিশ্রের দুহিতা। তাঁহার আর পুত্র-সন্তান ছিল না, একমাত্র কন্যা বলিয়া মিশ্র ঠাকুর এবং তাঁহার গৃহিণী লীলাবতীকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন—পরম স্নেহ-যত্নে ও আদরে লালন-পালন করেন। তিনি ভাবেন—লীলাই আমার পুত্র, লীলাই আমার ধন-সম্পত্তি, লীলাই আমার অন্ধের যষ্টি—আঁধার ঘরের মাণিক। তাই ব্রাহ্মণ কন্যা লীলাবতীকে নয়নে নয়নে রাখেন, লীলা লীলা করিয়া খুন হন। কোন স্থান হইতে বাড়ী আসিয়া অগ্রে লীলার খোঁজ-খবর লইয়া পরে পদ প্রক্ষালন করেন। লীলাও পিতৃ-মাতৃ-অনুরক্তা সুশীলা মেয়ে—সরলতায় ভরা! পিতা-মাতাকে বড়ই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

গণপতি মিশ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—সম্মানিত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, যাজকতা করিয়া ও বিধি-ব্যবস্থা দিয়া যাহা কিছু বিদায়-আদায় পান এবং নিজের বিঘা কয়েক ব্রহ্মত্র জমি হইতে যে আয় হয়, তাহাতে সংসারটা একরূপ চলিয়া যায়, কিন্তু তহ্‌বিলে কিছু জমে না। তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত লীলাবতীর বিবাহ দিতে পারেন নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণী কন্যার বিবাহ জন্য কতই

ভাবেন, স্বামীর উপর সময় সময় বকা-ঝকা করেন। কিন্তু স্বামীর কি অসাধ? তিনিও যে রাত্রি-দিন সেই চিন্তাতেই বিব্রত—স্বতঃ পরতঃ কত ঠাঁই পাত্র অন্বেষণ করেন। কিন্তু অবস্থার গতিকে কেহ যে ঘেঁষিতে চায় না! বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা ঘরে রাখিয়া তাঁহার কি নিদ্রাহার আছে? তিনি আহার করেন বটে, কিন্তু বোধ হয়, পেট ভরিয়া খাইতে পারেন না; হাসেন বটে, কিন্তু সে হাসির ভিতরেও যেন বিষাদের ছায়া থাকে! ব্যথিতের সে ব্যথা অন্যে কি বুঝিবে? মিশ্র ঠাকুর ভাবেন,—আমার বৃদ্ধকাল, আর বেশী দিন চলা-ফেরা করা ঘট্‌বে না, সংসার চালান কঠিন হবে। এ অবস্থায় যদি কোন সৎ পাত্রে—হোক সে দরিদ্র, লীলাকে সম্প্রদান ক'রে ঘর-জামাই ক'রে রাখ্‌তে পারি, তবেই আমার মঙ্গল! ঘর-বাড়ী বজায় থাকে—ভিটেয় পিদিপ জ্বলে। আর শেষ কালটা কন্যা-জামাতার মুখ দেখে গঙ্গালাভ করি। ভগবান তা কি করবেন!

ব্রাহ্মণ এই চিন্তাতেই সদা মুহ্যমান। বালিকা লীলাবতীও চিন্তার হাত এড়াইতে পারে নাই। তাহার প্রফুল্ল মুখখানি যেন সদাই শুষ্ক—চিন্তামগ্ন! সে প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাতা বা প্রিয় সঙ্গী বামা ও প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে যায়, আর মনে মনে মনোমত পতি পাইবার জন্য মা-গঙ্গার কাছে প্রাণের ব্যাকুলতা জানায়, মৃত্তিকায় শিব গড়াইয়া পূজা করে। আবার আহারান্তে আপনার শয়ন-ঘরে একাকী বিছানায় পড়িয়া অন্য-মনা হইয়া কি ভাবে! উপযুক্ত বয়সে বিবাহ না হইলে স্ত্রী-পুরুষ কাহার মনে না সঙ্গ-লাভের কামনা জাগিয়া উঠে?

মিশ্র ঠাকুর ত্রিবেণী নগরীর প্রান্ত ভাগে বাস করেন। এই অংশে লোকের বসবাস অতি কম। দুই ঘর ব্রাহ্মণ, দুই ঘর কায়স্থ, তিন ঘর বৈদ্য, ঘর কতক সোণার বেণে, কলু, তামলী আর কতকগুলি গোয়ালা, মালী, ময়রা, বারুই, দুলে, মালো তাঁহার প্রতিবাসী। চারিদিকে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, বাঁশ ও নানা গাছ-গাছড়ার জঙ্গলে আচ্ছন্ন, আর তাহারই ভিতর তফাত তফাত লোকের বাস-গৃহ—সমস্তই তৃণাচ্ছাদিত! এক ঘর বৈদ্য ও ঘর দুই তাম্‌লীর অবস্থা বেশ উন্নত। কিন্তু তাহাদেরও গৃহ ইষ্টক-রচিত নহে।

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, তখন এ দেশে লোকে ইটের ব্যবহারই জানিত না—অথবা খুব কমই জানিত। সমগ্র ত্রিবেণী নগরীতে কেবল গুটী দুই দেবালয় ও দুই একটী ইষ্টক-রচিত বাড়ী দৃষ্ট হইত। নতুবা যিনি যত বড়ই লোক হউন, খড়-বংশ রচিত চালের আশ্রয়ে থাকিতেন। পাঠক! বিস্মিত হইবেন না, হিন্দু-রাজত্বকালে যে সপ্তগ্রাম-বন্দরের শোভা-সমৃদ্ধির ইয়ত্তা ছিল না, তাহারও এই দশা ছিল। তাহার প্রমাণ হিন্দু গ্রন্থেই আছে। প্রাচীন কবি কৃষ্ণরাম লিখিয়া গিয়াছেন :—

"সপ্তগ্রামে যে ধরণী তার নাহি তুল,
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী-কূল।"

যখন একটী প্রধান জনপদের অধিবাসীরাই চালে চালে বাস করিতেন, তখন পল্লীগ্রামের অবস্থা আর কি হইবে?

আমাদের গণপতি ঠাকুরের বাসগৃহও তৃণময়। তাঁহার

পাশা-পাশি দক্ষিণদ্বারী বাসের ঘর দুই খানি, আর একটু তফাতে পূর্ব্ব-দ্বারী এক খানি লম্বা চালা ঘর। ইহার এক দিকে একটী গাভীর আশ্রম এবং অন্য দিকে রন্ধন-কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। রান্নাঘরের পশ্চাতেই ছোট্ট একটী পুকুর, টোকা-পানায় ভরা। বাড়ীর চারিদিকে জিউলী, কচা, চিতা এবং নানা আগাছার উঁচু বেড়া, বেড়ার বাহিরে অনেক গাছ, ভিতরেও দুই চারিটী আম, কাঁঠাল, নারিকেল তরু। তদ্ভিন্ন দক্ষিণাংশে বেলা, জবা, করবী, শেফালিকা ও অন্যান্য ছোট ছোট ফুলের অনেক গাছ। ফুল গাছগুলিতে লীলাবতীর বড়ই যত্ন, সে গাছের গোড়ায় মাটি দেয়, জল দেয়, গাছের পিঁপড়ে-পোকা-মাকড় মারিয়া ফেলে।

বাড়ীর অঙ্গনটীও বেশ পরিপাটী—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঘাস-দূর্ব্বার নাম মাত্র নাই। বাসগৃহ দুই খানিও বেশ ঝরঝরে—পরিষ্কার। ঘরের ভিতর দরিদ্র গৃহস্থের যে সব সামগ্রী থাকা সম্ভব, সে সমস্তই সুন্দর থরে থরে সাজান। ফলতঃ বাড়ী খানি দেখিলেই মন আনন্দে ভরিয়া উঠে, বাড়ীর লোকদের উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মে।

এক খানি ঘরের দুই দিকে দাওয়া—সদর-মফস্বল দুই-ই আছে। সদর দিকে লোকজন আসিলে স্থান পায়—পুরুষদের বসা-উঠা চলে। এই ঘরের ভিতর এক খানি তখ্‌ত্‌পোষ, একটী বাতা-মারা সিন্দুক আর এক খানি জলচৌকি! জল-চৌকির উপরে কতকগুলি ন্যাকড়া-জড়ান পুঁথি, কাগজ, কলম, দোয়াত আর এক খানি কলম-কাটা কামারে ছুরি। এই ঘরটী

দরাফ খান গাজী

গণপতি মিশ্র এবং তাঁহার পত্নীর বাস-গৃহ। পাশের ঘরখানিতে শয়ন করে কন্যা লীলাবতী আর একটী প্রতিবাসী দরিদ্র তাম্‌লীর মেয়ে—নাম বামাসুন্দরী। বামাসুন্দরী বাল-বিধবা—সচ্চরিত্রা, বয়স বিংশ উত্তীর্ণ। বামার রূপের গাঙে ভরা জোয়ার, যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ বামার অঙ্গে ঢল-ঢল বিদ্যমান। বামার বর্ণ শ্যাম—গাঢ় শ্যাম নহে। গড়ন-পড়ন বেশ পসন্দসই। সংসারে বামার আপন বলিতে বৃদ্ধা মাতা আর একটী ভাই আছে। ভাইটী বিবাহিত, পান বিক্রয় করিয়া কোনরূপে সংসার চালায়।

বামার সহিত লীলাবতীর বড় ভাব—প্রাণে প্রাণে মিল; লীলা বামাকে সই বলে। এই আত্মীয়তা—ভালবাসার খাতিরে বামা লীলাদের বাড়ীতেই থাকে, ঘর-দ্বার ঝাঁট্‌-পাট্‌ করা, থালা-বাসন মাজা, গোয়াল সাফ করা, জল আনা প্রভৃতি কাজ-কর্ম্ম বামা করে! তাহার পুণ্য-কাজ ব্রাহ্মণ-সেবা এবং উদর-সেবা, দুই-ই চলে। সে ব্রাহ্মণীকে মা বলিয়া ডাকে, ব্রাহ্মণীও বামাকে মেয়ের মত ভালবাসেন।

বামা বড় চতুরা—ভারী রসিকা! সে গল্প-গুজব করিতে বড় পটু, ভাল মন্দ যেখানে যে গুজবটী রটে, যে ঘটনা ঘটে, বামা তাহার খবর গঙ্গার ঘাটে জল আনিতে গিয়া পাঁচটা বৌ-ঝির মুখে শুনিয়া আসে, আর সইএর কাছে বিনাইয়া বিনাইয়া বলে; তাহাতে উভয়েই খুব আমোদ অনুভব করে। এইরূপ হাসি-খুশীতে মিলিয়া মিশিয়া দুইটীতে সময় কাটায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বপ্নদর্শন

চতুর্দ্দশীর চাঁদ আকাশে—যেন সুন্দরীর সীমন্তে সিঁদুরের ফোঁটা! চাঁদ হাসিতেছে; হাসিতে হাসিতে, ভাসিতে ভাসিতে, দুলিতে দুলিতে যাইতেছে, আর শুভ্র-নীল মেঘের আড়ালে গিয়া লুকো-চুরি খেলা করিতেছে। তাহাতে অবনী-আকাশ এই ধব্‌ধবে উজ্জ্বল, এই আবছায়ায় ডুবিয়া যাইতেছে। মেঘের দ্রুত সঞ্চরণে ক্ষুদ্রপ্রাণ নক্ষত্রদের বড়ই দুর্গতি হইয়াছে—তাহারা যেন অকূল সাগরে তরঙ্গ-তাড়নায় হাবু-ডুবু খাইতেছে। সময়টা অতি মধুর —অতি আনন্দ-দায়ক! প্রকৃতি যেন চারিদিকে কি এক অমিয়া ছড়াইয়া দিতেছে।

এক দিন এইরূপ সময়ে লীলাবতী ও তাহার সই বামা তাহা-দের শয়ন-ঘরের দাওয়ায় আসীনা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বৃদ্ধ মিশ্র ঠাকুর গৃহমধ্যে শয়ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণী ঘরের দাওয়ায় গড়াইতেছেন। তিনি কন্যার শয়ন-কক্ষের দিকে কাণ রাখিয়া দাওয়াতেই শয়ন করেন, মাঝে-মিশেলে কন্যার কাছে গিয়াও শয়ন করেন।

বামা রান্না-ঘরের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া, ঠাকুরের গাড়ু-গামছা-জল যথাস্থানে রাখিয়া, গরুটাকে জাব দিয়া, বাছুরটীকে সাবধানে বাঁধিয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছে। ক্লান্তির জন্য একটী

খুঁটীতে ঠেস্ দিয়া, পা দু-খানি ছড়াইয়া দিয়াছে। শ্রম হেতু তাহার যৌবন-স্বভাব-সুলভ পুষ্টাঙ্গের স্থানে স্থানে বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইয়াছে, তাই তাহার ঊর্দ্ধাঙ্গের কাপড় কেবল বুকের উপরেই নিবদ্ধ রাখিয়াছে। তাহাতে তাহার দলমলায়মান যৌবন-শ্রী আধ-বহির্গত, আধ-বস্ত্রাবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

বামা চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহে। সে কাজের সময় কাজ করে, আর একটু অবসর পাইলেই, "ও পাড়ার নয়নতারার ভর যৈবন, কিন্তু স্বোয়ামীর ঘর করে না," "হরিমতির স্বোয়ামী বেশ, হরিমতিকে কত সোণা-দানাই দিয়েছে," "রামা বেণের বাড়ীতে রাত হলেই নাকি ভূতে ঢিল মারে, বেণেদের মেজো বউএর উপরেই নাকি ভূতের দিষ্টি" ইত্যাদি রাজ্যের খবর—নানা খোস-গল্প বলে, ছড়া কাটিয়া আসর গরম করে।

আজ বামা একটু বিশ্রাম করিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"ও সই, আর শুনেছ, ও-পাড়ার নাওয়ার ঘাটে, একটা ভৈরবী ধরা পড়েছে। আহা কি তার রূপ! যেন সাক্ষাৎ দুগ্‌গো পিত্তিমে!"

এই সময়ে লীলাবতী বিমনা হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। অবিবাহিতা নব-যৌবনা কুমারীর কোমল হৃদয়ে সে কিসের ভাবনা, কেমন করিয়া বলিব? বামা লীলাবতীর গা-নাড়া দিয়া বলিল,—"সই, ও-দিকে তাকিয়ে আনমনে কি ভাবচ্?"

লীলাবতীর চমক ভাঙ্গিল—চিন্তা ছুটিল। বলিল,—কি

আর ভাব্ব সই ? আকাশে হাজার হাজার তারা—যেন মালঞ্চ আলো ক'রে ফুল ফুটেছে, মাঝখানে তার চাঁদ, কি চমৎকার শোভা ! চাঁদের আলো গাছের পাতায় পাতায় প'ড়ে চিক্-মিক্ চিক্-মিক্ করছে ! আহা কেমন শোভা ! আমি এই শোভা দেখ্‌ছি ।"

বামা মুখ টিপিয়া হাসিল ; বলিল,—"দেখার সাথে ভাবনাও আছে, তা সে ভাব্‌নার কূল-কিনারা কৈ ? আমি যখন তোমার মত ছিলাম, আমিও কত ভাব্‌তাম, ভাবনার আর পার ছিল না । তখন প্রাণের ভেতর যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগ্‌ত । মনে হ'ত, আমার কি যেন নেই—কিসের যেন অভাব ! কারে যেন আমার চোখ খুঁজ্‌ত । কিন্তু কি যে নেই, কিসের অভাব, কেন প্রাণটা ফাঁকা-ফাঁকা, কিছুই বুঝ্‌তে পারতাম না । কারুর কাছে ফুটে বল্‌বারও যো ছিল না—লজ্জায় মনের জ্বালা মনেই চেপে রাখ্‌তাম । তার পর এক দিন শুভক্ষণে আমার দুঃখের নিশি ভোর হ'য়ে গেল—আমি সুখ-সাগরে ভাসতে লাগ্‌লাম । কিন্তু অভাগীর পোড়া কপালে হায় ....."

বামা আর কিছু বলিতে পারিল না, শোকে তাহার কণ্ঠরোধ হইল, টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, ফোঁশ করিয়া একটী টানা নিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল ।

লীলাবতী বামার কষ্ট বুঝিয়াও বুঝিল না, তলাইয়া বুঝিবার শক্তিও তার ছিল না । লীলাবতী তাড়াতাড়ি বলিল,—"সই, চুপ কর, মা শুন্‌তে পাবেন ।"

বামা আবার যে সেই, নিজের কষ্টের কথা আর তাহার মনে

রহিল না, মৃদু অথচ গম্ভীরস্বরে আবার বলিল,—"আমি তো আর মন্দ কিছু বল্‌চিনে ? তা আকাশে ঐ তারা ফোটার মত, মালঞ্চে ফুল ফোটার মত, তোমার বিয়ের ফুলটী কি আর ফুট্‌চে না সই ? বিধেতা সে ফুল কবে ফোটাবেন ? কবে সে সুখের দিন আস্‌বে ? কবে তোমার হৃদয়-চাঁদ উদয় হ'য়ে তোমার মনের আঁধার ঘুচাবে ? আর সোহাগের পরশ পেয়ে ঐ মন-মজানো প্রাণ-ভুলানো তনুখানি ডগমগ কর্‌বে ?"

বালিকা বামার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"ছি, সই ছি ! আবার ঐ কথা, মা শুন্‌লে যে লজ্জায় ম'রে যাব—মুখ দেখাতে পারব না। যাও, তুমি একলাটী ব'কে মরগে—আমি ঘরের ভেতর চল্‌লাম।"

ইহা বলিয়া লীলাবতী ঘরের ভিতর গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল। বামা—"আচ্ছা সই যাও" বলিয়া সেই খানেই শুইয়া পড়িল ! বলা বাহুল্য, বামার দুই-এক দিন দাওয়াতেও শোওয়ার অভ্যাস ছিল।

লীলাবতী ঘরের ভিতর গিয়া এক খানি ছোট্ট তখ্‌ত্‌পোষে কাঁথা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। কাঁথাখানি বামার হাতের কত রকমের লতা-পাতা-ফুল ও পশু-পক্ষীর মূর্ত্তি রং-বেরঙের সূতায় সেলাই-করা। লীলাবতী বালিশে মুখ লুকাইয়া ভাবিতে লাগিল—"সই তো ঠিক বলেছে ! আমারও মনটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা। মা-বাবার এত স্নেহ, এত আদর, তবুও মনে সুখ নেই, কি জানি কিসের জন্যে প্রাণটা যেন উদাস- উদাস ! বিশেষ সে দিন সই আমার যে কথা বলেছে, তাতে আমার মনটা যেন আরো ফাঁকা

মেবে গিয়েছে। আহার-নিদ্রা, শোওয়া-বসা কিছুই ভাল লাগচে না—কিছুতেই মনে শোয়াস্তি পাচ্চি নে। ভেতরে ভেতরে কি যেন কিসের বেদনা বোধ হচ্চে। চারিদিক যেন শূন্য—কথা কইতেও ইচ্ছে করে না। সদাই সইএর সেই কথা তোলা-পাড়া! সই বলেছে,—"মানুষ অনেক আছে, কিন্তু এমন আশ্চর্য্য মানুষ কখন দেখি নাই। কি তার রূপ—কি তার গড়ন-পড়ন! কি তার চাঁদের মতন সুগোল সুন্দর মুখ খানি। চক্ষু দুটী বাঁকা—বিলোল চাহনি! আবার সে ধীরতা-নম্রতায় ভরা। তার মাথায় নাকি আবার মণি-মুক্তা-বসান সুন্দর শিরোভূষণ! মাথায় মুকুট দিয়ে তার ভুবন-মোহন রূপ নাকি আরো ফুটে উঠেছে। আহা বিধাতা......"

এই কথা সাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতেই দেখিল—ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বামা ঘরে শুইবার জন্য তাহাকে ডাকিবে, এই আশায় সে এ পর্য্যন্ত প্রদীপ নির্ব্বাণ করে নাই। এখন দেখিল, তেল পোড়াইবার আর দরকার নাই, বামা ফোঁশ-ফোঁশ করিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

লীলাবতী ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ধীরে-ধীরে শুইল। আবার সেই চিন্তা! আবার সেই চিন্তা,—লোহাকে চুম্বক যেমন আকর্ষণ করে, বালিকার হৃদয়কে তেমনি আকর্ষণ করিল। বালিকা ভাবিতেছে—যার এত রূপ, এত লাবণ্য, সে কি মানুষ? সে দেবতা। সেই দেবতার চরণতলে যে স্থান পায়—সেই দেবতার মধুর কথায় যার কর্ণ জুড়ায়, সেই

সুখী—সেই ধন্য ! তার জন্ম সার্থক ! আমি কি সেই দেবতাকে দেখতে পাব না ? সই স্নানের ঘাটে তাঁকে দু-বার দেখেচে। কৈ আমি তো তাঁকে এই পোড়া চক্ষে একবারটীও দেখতে পেলাম না !! আমি নাইতে যাই—গা-ধুতে যাই, আর গঙ্গার ঘাটের আশে-পাশে আকুলি-ব্যাকুলি তাকাই, দরকার না থাকলেও সইএর সাথে গা-ধোওয়া আর জল-আনার ছল-ছুতায় গিয়ে পাতি-পাতি ক'রে খুঁজি ; কিন্তু কৈ ! পাপ নয়নে সে দেবতা তো পড়ে না ! হায়রে হতভাগিনীর কপাল !"

বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার দুই চক্ষু হইতে দরদরধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া বালিশ ভিজাইয়া দিল। বালিকার যে কি কষ্ট, তাহা বিধাতাই জানিতেছেন। আঁচলে মুখ মুছিয়া আবার সে ভাবিতেছে,—"ওঃ আমার কি ভুল—মস্ত ভুল ! তিনি যে দেবতা ! দেবতার দেখা কি সহজে মেলে ? কি এমন পুণ্যি করেছি যে, সেই দেবতার দেখা আমি পাব ? কিন্তু না দেখেও—আরো তো কত পুরুষ আমি দেখেছি, কত নবীন যুবা চাঁদের শোভা মুখে নিয়ে অপরূপ বেশে আমার চোখের সামনে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়, তাদের কারেও তো আমার মনে পড়ে না, কারো জন্যে তো মন এমন আকুল হয় না ! কিন্তু না দেখে সে রূপের জন্যে মন এমন হল কেন ? বুক ফেটে যাচ্ছে ! কেন এমন হল, বুঝ্‌তে পাচ্চিনে ! আমি যে-দিকে তাকাই, সেই সুন্দর রূপ-মাধুরীই আমার চক্ষের সামনে ভেসে ওঠে ! আমি সেই দেবতাকে শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে, অন্তরে-বাহিরে সদাই দেখ্‌চি—আমার নয়নে সে মনোমোহন ছবি লেগেই

আছে। নাইতে গিয়ে গঙ্গার স্তব আর মনে আসে না—শিবের পূজা ভুলে যাই! ফুল-বিল্বদল যেন সেই হৃদয়-দেবতার পদেই দিচ্ছি, মনে হয়। আর অন্তর তখন বলে,—"হে প্রাণারাম, হে আমার প্রাণের প্রাণ! এ অবলারে কি সদয় হবে না? দুখিনীর দুঃখ কি দূর করবে না? আমি তোমারে দেখি নাই, তুমি কোথায় থাক, জানি না, সইএর মুখে তোমার ভুবনমোহন রূপের কথা শুনে তোমাকে ভালবেসে ফেলিচি—এ প্রাণ, এ জীবন-যৌবন তোমাকেই সঁপেছি! একবার দেখা দাও।"

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে বালিকার মনের গতি অন্য দিকে ফিরিল। তাহার মনে হইল, তাহার মা-বাপ তাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন—স্নেহ করেন। একটু কিছু হইলে ভাবিয়া আকুল হন—শত যত্নে প্রতীকার করেন। কিন্তু এই যে তাহার প্রাণ পুড়িতেছে, তবুও তো মুখ ফুটিয়া সে ব্যথা জানাইতে পারিবে না! তাই সে ব্যাকুলভাবে সজল নয়নে বলিয়া ফেলিল,—"মাগো,——আমার কি হল গো মা?"

এই দুর্ভাবনায় লীলাবতীর ঘুম নাই, লীলাবতী বড়ই ব্যাকুলা,—বড়ই চঞ্চলা! একবার বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল; দেখিল, বামা ঘুমাইতেছে। ভাবিল, বামাকে ঘরে ডাকি—মনের কথা তারে বলি। আবার ভাবিল,—না, এখন কিছু বলা হবে না। দেখি, বিধাতা কি করেন। তিনি কি এ দুঃখিনীর কাতর ক্রন্দন কাণে করবেন না? যদি নিতান্তই না করেন, তবে

জগৎ-জননী জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিয়ে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার শেষ করব।”

বালিকা চিন্তা-বিজড়িত চিত্তে আবার শুইল! তখন রাত্রি দুই প্রহর। যেমন শয়ন, অমনি সর্ব্ব-শান্তি-বিধায়িনী নিদ্রা ধীরে ধীরে—ক্রমে ক্রমে তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহের উপর শীতল স্পর্শ বুলাইয়া দিল; বালিকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমে স্পন্দহীন—ক্রিয়াশূন্য হইল; আয়ত নয়নদ্বয় ধীরে ধীরে—অল্পে অল্পে বুঁজিয়া আসিল—বালিকা ঘুমাইল।

লীলাবতী নিদ্রা-ঘোরে স্বপ্ন দেখিল। দেখিল,—নদীর ধারে কুঞ্জ-কানন! কানন আলো করিয়া জাতি, যুথী, বেলা, মল্লিকা, মালতী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি নানা জাতীয় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ফুলের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে। মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া মৌমাছিরা ফুলে ফুলে মধু লুটিতেছে, উৎপীড়িত ফুলবধূ কুলবধূর ন্যায় শরমে জড়-সড় হইতেছে! নদী কুলু কুলু করিয়া বহিতেছে, নদীর গানের সহিত লতা-বিতানের ভিতর হইতে কোকিলের কুহু-তান, পাপিয়ার পিউ-তান উঠিয়া চারিদিক মাতাইয়া তুলিয়াছে। স্থানটী বড়ই পবিত্র—বড়ই সুন্দর! যেন সেখানে ঝর্‌ঝর্ করিয়া শান্তির ঝরণা ঝরিতেছে—স্বর্গের সৌন্দর্য্যে ভরিয়া গিয়াছে!

কুঞ্জ-কাননের মধ্যস্থলে একটী সুন্দরী রমণী—এলায়িত কেশ, সুন্দর বেশ! শান্ত উজ্জ্বল বদন—সদা প্রফুল্ল! রমণীর দেহ হইতে যেন জ্যোৎস্নার রজত-ভাতি ঠিকরিয়া পড়িতেছে। অদূরে আর একটী দৃশ্য! একটী সুঠাম সুন্দর নবীন যুবা

দণ্ডায়মান ! তাঁহার দেহ অপূর্ব্ব পোষাকে ঢাকা, শিরে সুন্দর শিরোভূষণ, বদন শান্ত—সদ্ভাবপূর্ণ ! তাঁহার প্রশস্ত ললাট লাবণ্যময়, তাহাতে যেন আবার ধীরতা, সংযম, দৃঢ়তা, পরোপকার ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে।

লীলার দৃষ্টি এই যুবকের দিকে। তাহার নয়নে আর পলক পড়িতেছে না, সে আর কিছুই দেখিতেছে না, কেবল অবাক্ নয়নে যুবার দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছে, তাঁহার ভাব-ভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিতেছে—তাঁহার বদন-সুধাকরের সুধা পান করিতেছে। ইচ্ছা ছুটিয়া যায়, আকুলি-ব্যাকুলি ছুটিয়া গিয়া পদতলে লুটিয়া পড়ে, দুইটা কথা কহিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়ায়। কিন্তু তাহার পা উঠিতেছে না—কথা সরিতেছে না। বালিকা যেন সম্মোহন-মন্ত্র-মুগ্ধা—বিহ্বলা !

বালিকার এই অবস্থা দেখিয়া রমণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"বালিকে ! কি দেখিতেছ ? শান্ত হও, ধৈর্য্য ধর, ব্যাকুল হইও না ! তুমি যে সুখের অন্বেষণে ব্যগ্র, যাহার উপাসনা দিবা-রজনী করিতেছ, তাহা তুমি পাইবে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে ; ঐ ধর্ম্মপ্রাণ যুবকের পদে তুমি স্থান প্রাপ্ত হইবে—ধন্যা হইবে। কিন্তু ব্যস্ত কেন ? ব্যস্ততায় কি সুখ-সৌভাগ্য শীঘ্র ঘটে ? সময়ে তোমার জ্বালা-যন্ত্রণা ঘুচিবে, তুমি অতুল সুখের অধিকারিণী হইবে। কিন্তু সাবধান,—মন স্থির, হৃদয় দৃঢ় রাখিও। জানিও, আমি ভাগ্যদেবী !"

কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রমণী অদৃশ্য হইলেন। যুবাও এক পদ, দুই পদ করিয়া যেই সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন,

অমনি "দাঁড়াও হে প্রাণারাম! যদি দয়া ক'রে দেখা দিলে, হে হৃদয়-দেবতা, মিনতি করি, ক্ষণেক দাঁড়াও, আর একবার প্রাণ ভরিয়া তোমার রূপ দেখি" বলিয়া চীৎকার করিয়া বালিকা যেমন দৌড়াইবে,—মনে হইতেছে যেন দৌড়াইতেছে, অমনি চমকিয়া ধড়-মড় করিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল, ঘুমও ধড়াস্ করিয়া ছুটিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিল; দেখিল—কিছুই নাই! কোথায় সে ভাগ্য-দেবী, কোথায় বা সে প্রিয়দর্শন যুবক, কোথায় বা সেই কুঞ্জ-কানন আর কানন-ভরা ফুলদল! কিছুই নাই— আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

বালিকার হৃদয় শূন্য হইল, অন্তর উদ্বেগপূর্ণ—আরো দমিয়া গেল, মুখ বিরস—বিবর্ণ হইল। বালিকা আবার শুইল, আবার চক্ষু মুদিল; ইচ্ছা, সেই সুখ-স্বপ্ন আবার দেখে—আবার সেই আরাধ্য দেবের চন্দ্রবদন হেরিয়া প্রাণের পিয়াস মিটায়! কিন্তু কৈ? সাধের স্বপন আর তো নয়নে আসে না! সে প্রাণ-প্রতিমার প্রেমময় ছবি আর দেখা দিল না? হায় হায়! দেখা দিয়ে কোথায় লুকাইল? বালিকা উদ্বেগে উশ্‌পিশ্ করিতে লাগিল; একবার এ-পাশ, একবার ও-পাশ, একবার উপুড় হইয়া শুইল! কিন্তু কিছুতেই সোয়াস্তি নাই—শান্তি পাইল না। বালিকার কোমল প্রাণে পাষাণ পিষিয়া যাইতে লাগিল, মন অবসাদে ডুবিয়া গেল। চক্ষে টস্ টস্ করিয়া পানি ঝরিল।

অশ্রুময় চক্ষে লীলাবতী চাহিয়া দেখিল, আকাশ ফরসা হইয়া আসিয়াছে। পাখীরা প্রভাতী গাহিতেছে, কোকিলের পঞ্চম স্বর, দয়েলের ললিত রাগিণী, পাপিয়ার পিউ-পিউ ধ্বনি চারিদিক

মাৎ করিয়া তুলিয়াছে। তখন উঠান হইতে একটী বৃদ্ধা রমণী দাওয়ার ভিতর উঁকি দিয়া বলিলেন,—"মা নীলি! এখনো উঠিস্‌নি? বামা, ও বামা! আজ তোরও বাছা এত ঘুম?"

বামা ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া কাপড় সামলাইয়া বসিল, দুটী হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জানালার কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—"সই—ও সই! ওঠ, ভোর হয়েচে, ফুল তুল্‌বে না? ছ্যানে যাবার সময় হয়েছে, ওঠ!"

লীলাবতী অলস—অবশ অঙ্গে ধীরে ধীরে উঠিল, আঁচলে চোখ মুছিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

"সই! ঘুমের ঘোরে কি বল্‌ছিলে? চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন? ওমা! তোমার মুখ খানা যে পাঙাস হয়ে গিয়েচে! চোখ দুটী ছল-ছল......"

বালিকা বামার কথার উত্তর না দিয়া নীরবে ঘর হইতে উঠানে নামিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন-প্রকাশ

মানবের হৃদয়-কানন আলো করিয়া যে সব ভাবের ফুল ফোটে. তাহাদের মধ্যে প্রণয় সৌরভপূর্ণ শতদল পদ্ম। এ ফুলের সৌরভে জগৎ মুগ্ধ—ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-মূর্খ, সাধু-অসাধু, ছোট-বড় সকলেই ইহার বশীভূত। সকলেই এক সময়ে ইহার সম্মোহিনী শক্তির পায় লুটাইয়া পড়ে—উপযুক্ত উপাদান খুঁজিয়া লইয়া ইহার পূজা করে।

প্রণয়ের গতি অতি বিচিত্র! ইহা যে কখন্ কিরূপে হৃদয় অধিকাব করে, তাহা কেহ জানে না—বলিতে পারে না। বিজলী যেমন সহসা আবির্ভূত হইয়া চমক্ লাগায়, আগুন যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, উঠিয়া জেল্লা দেখায়, প্রণয়ও তেমনি হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া অন্তর আকর্ষণ করে। মানব সেই আকর্ষণের বশে ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় চলে—লজ্জা-ভয়, দিক্-বিদিক জ্ঞান থাকে না—প্রাণারামের পায় প্রাণ সঁপিতে ছোটে।

আমাদের লীলাবতী প্রণয়ের সেই আকর্ষণে আকৃষ্টা। তাহার হৃদয়-কাননে প্রেমের কুসুম কলিকারূপে দেখা দিয়াছে এবং তাহা বিকাশের অনুরাগে আকুল হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহার প্রাণারাম কে, তাহা জানে না—চেনে না, কোনও কালে চক্ষেও দেখে নাই, কোথায় তাহার বসতি, কোন্ কুলে জন্ম, তাহার খবর

সে রাখে না, কিন্তু সখী-মুখে রূপের কথা শুনিয়া বালিকার প্রাণ গলিয়াছে—মন মজিয়াছে, তাহার হৃদয়ের পরতে পরতে সেই রূপময় ছবি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, পলে পলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মধুর ভাবে নব নবরূপে সে রূপ তাহার নয়নে প্রতিভাত হইতেছে। তাই সে তাহার জীবন-জুড়ান ধন পাইবার জন্য আকুল—উদ্বিগ্ন।

পাঠক দেখিয়াছেন, বামার ডাকে বালিকা নীরবে ঘর হইতে নামিয়া গেল, নীরবে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নীরবে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। প্রতিদিন মা-গঙ্গার স্তব-স্তুতি, শিব-পূজা যে ভাবে করে, সেইরূপ করিল বটে, কিন্তু সেই মনে করিত পারিল না। তাহার মনে স্বপ্ন-দৃষ্ট যুবকের চেহারা—ভাব-ভঙ্গী জাগিতেছে। নদীর কূলে, পথে-ঘাটে সে সেই রূপ দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না! পিপাসা-পীড়িতা চাতকী বারিধারা না পাইয়া বিষণ্ণ চিত্তে দিন যাপন করিতে লাগিল।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন যায়, চতুর্থ দিন অপরাহ্ণ সময়—তখনও সূর্য্য পাটে বসিবার বিলম্ব আছে; মিশ্র ঠাকুর যজমান বাড়ী গিয়াছেন, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী দাওয়ায় বসিয়া আপন মনে পৈতা পাকাইতেছেন। লীলাবতী তাহার ক্ষুদ্র ফুল-বাগানে উপস্থিত। লীলার দৃষ্টি চঞ্চল—কখন পথের দিকে, কখন এ-গাছে সে-গাছে, কখন গাছ-পালা ডিঙ্গাইয়া সে দৃষ্টি অন্য কোথায় ছুটিতেছে। বালিকা অবশেষে বেড়ার নিকটে একটী ক্ষুদ্র তরু-শাখা ধরিয়া দাঁড়াইল। আহা কি সুন্দর দৃশ্য! যেন প্রমোদ-কাননে একটী চিত্ত-হারিণী পরী!

বালিকা অধোমুখী হইল। দেখিল, ছোট ছোট গাছ গুলিতে

কতই ফুল। ফুল ফুটিয়া বাগান আলো হইয়াছে। অমনি দপ্ করিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্পষ্ট তাহার মনে জাগিল—ম্লানমুখে অস্ফুট-স্বরে বলিল,—"এই তো সেই ফুল-বাগান। এই বাগানেই তো আমার প্রাণারাম দাঁড়িয়েছিলেন! এই খানে ছিলেন—এই খানে তাঁর অপরূপ রূপ ঝর-ঝর করে ঝরে পড়েছিল! আহা ধন্য এই ভূমি! আমার হৃদয়-ভূমিতে কি সেই শ্রীপদ পড়বে না—রূপের ফোয়ারা ছুটবে না? সেই রূপ-সাগবে কি আমি ভাস্‌তে পাব না? প্রিয়তম! হে প্রাণসখা! দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে? দয়া ক'রে এসেছিলে, স্বর্গ থেকে দেবতা নেমেছিলে তো একবারটী দাসীর কুটীরে কি যেতে নেই? ওঃ! বুক যে ফেটে গেল, মন যে প্রবোধ মানে না। হে বিধাতঃ! অভাগিনীর মনোরথ কি পূর্ণ করবে না?"

বালিকা স্পন্দহীনা—ভাবনায় বাহ্য জ্ঞান-হারা! দর-দর-ধারে তাহার বুক ভাসাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আর কিছু বলিতে পারিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বামা অতি চতুরা, তাহার চক্ষে কিছু এড়াইবার যো নাই। সে আজ কয় দিন হইতে লীলাবতীর ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আসিতেছে, তাহার মুখ শুষ্ক—বিরস! আগের মত স্ফূর্ত্তি আর নাই। লীলা সকালে-বিকালে ফুল-বাগানে যায়, ফুল তুলিয়া মুখে-বুকে স্থাপন করে, আর চকিতা হরিণীর মত চারিদিকে তাকায়—কি ভাবে। কখন বা আম গাছের তলায় নতমুখে আনমনে বেড়ায়, কখন বা জানালার কাছে একলাটী অবাক-নয়নে বসিয়া থাকে। তাহার শরীর শুকাইয়া

গিয়াছে—মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। বামা এ সব পরিবর্ত্তন বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছে। স্নানের ঘাটেও তাহার ভাব চঞ্চল।

মায়ের অসুখ করিয়াছিল বলিয়া বামা কাজ-কর্ম্ম সারিয়া মায়ের কাছে রাত্রে শুইতে যাইত, তাই লীলাকে কিছু বলিবার অবসর পায় নাই! আজ পুকুরে বাসন-কোসন মাজিয়া আনিয়া দেখিল, লীলা ফুল-বাগানে রহিয়াছে। তাই সে ধীরে ধীরে সেই দিকে গেল, লীলাবতীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া ডাকিল—'সই!' বালিকা চমকিয়া উঠিল, তাহাব জাগ্রৎ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! তন্ময়ত্ব ঘুচিল! চক্ষু মুছিয়া চাহিতেই দেখিল—নিকটে সই।

"সই! একি? তুমি কি কাঁদচ?"

বামার এই কথা শুনিয়া বালিকা আবাব ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিল, তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল! ফ্যাল্ ফ্যাল্ কবিয়া সইএব দিকে চাহিতে লাগিল। কি উত্তব করিবে, খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু প্রাণের ব্যথা আর তো লুকান যায় না? আব তো 'না' বলিবার যো নাই! হাতে হাতে যে ধরা পড়িয়াছে! মস্ত বামাল তাহার দুটী চক্ষে আর মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান!

বালিকা তখন ধীরে ধীরে বামার নিকটে আসিল, তাহার হাতে হাত দিয়া নতমুখে করুণকণ্ঠে বলিল,—"সই! গোপন করে আর কি করব? সত্যই আমি কাঁদচি।"

"কেন? কিসের জন্যে কাঁদচ? তোমার কিসের কষ্ট?"

"কিসের জন্যে—কিসের কষ্ট, তা কি তুমি জান না সই? তুমিই তো আমাকে কাঁদিয়েচ? তুমিই এ কান্নার গোড়া!"

ইহা শুনিয়া বামা অবাক হইল। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দাঁতে জিভ কাটিল; বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া বলিল,—"সই! বল কি? আমি! আমি তোমারে কাঁদাব কেন দিদি!"

"না—সই! তোমারি কথায় আমার এই কান্না, তোমারি কথায় আমার বেদনা, আমার হৃদয় জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু তাতে তোমার তো কিছু দোষ নেই সই? দোষ আমার—দোষ আমার এই পোড়া অদৃষ্টের!"

বালিকার দুই চক্ষু দিয়া আবার বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিল। বামা তদ্দর্শনে অতিশয় ক্ষুব্ধা হইল, আরো ক্ষুব্ধা হইল সে কি করিয়াছে বলিয়া। কিন্তু সে আকাশ-পাতাল কতই ভাবিল—ভাবিয়া সে কি করিয়াছে, ঠিক করিতে পারিল না। তখন কহিল,—"দোহাই ধর্ম্মের—দুটী চক্ষেরি মাথা খাই, তোমার মনে ব্যথা দিব আমি? এ তো একবারটীও সই মনে আস্‌ছে না! তোমার ও-কথা শুনে আমার বড়ই দুঃখু হচ্চে। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। যদি না জেনে সই......"

বালিকা বাধা দিয়া বলিল,—"সই চুপ করো, মা শুন্‌তে পাবে। আমি বলি শোন।"

"বলি শোন" বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না, কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। ইহা দেখিয়া চতুরা বামা বুঝিল,—তাহার সইকে রোগে ধরিয়াছে; বলিল,—"সই! আমার কাছে বলতে এত জড়-সড় হচ্চ কেন? তুমি তো জান, তোমার সুখ-সোয়াস্তির জন্যে আমার আকিঞ্চন কত! লজ্জা কি সই, বল, তোমার ভালতেই আমার ভাল।"

তখন লীলার মলিন মুখে ঈষৎ প্রফুল্লতা দেখা দিল। বালিকা করুণস্বরে বলিল,—"সই! তুমি আমার প্রাণের সই! আমার প্রাণের ব্যথা—মনের কথা তুমি সব জান। ভাল-মন্দ সবই আমি তোমার কাছে বলি, তবে আজ লুকাব কি জন্যে?"

বালিকা আবার চুপ করিল, নতমুখে পদাঙ্গুলে মাটী খুঁড়িতে লাগিল। বামা বলিল.—"সই! আবার কি ভাব্‌চ? মনের ধুক্‌-ধুকুনি কেটে যাক। তোমার মলিন মুখখানা দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে।"

তখন বালিকার মুখ হইতে ধীরে ধীরে কথা বাহির হইল। বালিকা যেন দুর্ব্বলা রোগিণী। বলিল,—"সই! সেই যে সে দিন তুমি বলেছিলে—গঙ্গার ঘাটের কথা—সেই অপরূপ রূপের কথা!" আস্তে আস্তে এই কথা বলিয়া বালিকা দাওয়ার দিকে চাহিল। দেখিল, মা তখনও পৈতা পাকাইতেছেন। তখন আবার বলিল,—"সই! সেই কথা শুনে অবধি আমার মন যেন কেমন-কেমন হয়েছে, প্রাণে কিছুই ভাল লাগে না, সেই রূপ সদাই দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।"

লীলাবতীর কথা শুনিয়া বামা অবাক্‌ হইয়া গেল; মনে মনে ভাবিল,—সই আমার মরেছে। কিন্তু এমন মরতে কারেও কখন তো শুনিনি! প্রেমের অঙ্কুর চোখে; চোখে দেখেই লোকে প্রেমে মজে। কিন্তু এ কি? এ যে না দেখেই পাগল! অবাক্‌ আর কি! বামা লীলার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপে চুপে বলিল,—"হ্যাঁ সই! তুমি কি রাত-দিন তাই তোলা-পাড়া করো? কিন্তু তোমার কি মস্ত ভুল,—সে কে, কি জাত,

কোথায় থাকে, কেউ তারে জানে না—কেউ চেনে না! আমি মাত্র দু-দিন তারে ঘাটের ধারে দেখেছিলাম, তাই তোমাকে বলেছিলাম। তাতে কি তোমার এমনটী হওয়া উচিত? লোকে শুন্‌লে বল্‌বে কি? ছি সই! ও কুচিন্তা আর মনে ঠাঁই দিও না।"

এই কথায় লীলাবতীর লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—মুখ ফুটিল। বলিল,—"কুচিন্তা? সই, এ কথাটী আর মুখের আগায় এনো না। সেই-ই আমার সুচিন্তা, সেই-ই আমার তপ-জপ-ধ্যান! সে যেই হোক, যেখানেই থাকুক, আমি তার সেই ভুবনমোহন রূপ ঐ গাছের ফুলে, নদীর জলে, আকাশের গায়, মেঘের বিজলীতে, চাঁদের কিরণে, আর আমার এ হৃদয়-মন্দিরে নিত্য দেখ্‌চি। সেই কোন্ নন্দনের অজানা দেবতার পূজা আমি হৃদয়ের ভিতরে লুকিয়ে লুকিয়ে করি। আমার প্রাণ সেই রূপেরই ভিখারী, মন সেই সুধারই পিয়াসী।"

লীলাবতী ছল-ছল-নেত্রে ইহা বলিয়া নীবব হইল। বামা ক্ষণেক গম্ হইয়া থাকিয়া বলিল,—"সই! সব বুঝ্‌লাম। বুঝ্‌লাম, সোমত্ত বয়সে বিয়ে না হওয়াতেই তোমার এ ভাব ঘটেছে। বিয়ে না হলে এ চিন্তা আপনিই আসে। কিন্তু বাপ-মার কি বিয়ে দিতে অসাধ? তুমি তো জান্‌তে পাচ্ছ সই, তোমার মা-বাপ কত ঠাঁই ভাল বর খুঁজ্‌ছেন। তা সপ্তগ্রাম থেকে একটী সম্বন্ধ এসেছে, ঘটক হাঁটা-হাঁটি করছে। বরটীও নবীন যুবা, বয়স বছর কুড়ি—খুব সুন্দর। সই, আর কারুর কথা ভাবতে হবে না, শীগ্‌গীর মনের মত বর পেয়ে সুখ-সাগরে ভাস্‌বে।"

বামা ইহা বলিয়া বালিকার মুখ ধরিয়া মুচকি হাসিল ; কিন্তু লীলাবতীর সে হাসি ভাল লাগিল না, তাহার দেহ জ্বলিয়া উঠিল। বিরক্তির সহিত বলিল,—"সই! তুল না আর সেই বরের কথা। থাকগে যা তার ভুবন-ভরা রূপ, থাকগে যা তার মন-মজানো গুণ, তুল না—ও কথা আর আমার কাণে শুনিও না। আমার নয়নে যে রূপ ঘুরচে, আমার হৃদয়ে যে রূপময় দেবতা বিরাজ করচে, আমি যারে হৃদয়েশ্বর—প্রাণনাথ বলে বরণ করিচি, আমি সেই দেবতার চরণে আমার প্রাণ—আমার জীবন-যৌবন সঁপেছি। যারে মন দিইছি, তারে দেহও দিব। দিব কি? দিইছি। এক জনকে মনঃপ্রাণ দিলে কি আর জনকে বিয়ে কেউ করে? যে করে, সে পাপিনী, সে অসতী। মনঃপ্রাণ সোঁপার নামই যে সই বিয়ে!!"

ইহা বলিয়া উন্মাদিনী লীলা ছলছল আঁখে মাটীর দিকে চাহিল, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"সই—সই! এই সেই ফুল-বাগান, এই খানে—এই গাছের কাছে সেই রূপের নিধির বাবাম! এই খানে সই, এই খানে। ইচ্ছে আমার এই খানেতে দিবানিশি থাকি, এই মাটীতে লুটিয়ে প'ড়ে—এই ধূলো মেখে প্রাণের জ্বালা জুড়াই।"

লীলাবতীর এই অবস্থা দেখিয়া বামা স্তম্ভিত হইল, মনে মনে বলিল,—এ দেখ্‌চি রোগের পূরো বিকার! মুষ্টিযোগের দরকার। বামা ব্যস্ততার সহিত বলিল,—"সই! একি! একি! এত উতলা? ছি ছি! ঠাণ্ডা হও,—থামো। তুমিই না এখনি বল্‌লে,—চুপ করো, মা শুন্‌বে? এখনি বেহুঁশ! তুমি কি

বল্‌ছ ? 'এই খানে রূপের বারাম' এ কি কথা, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে সই ?"

তখন বেড়ার দিকে সইকে টানিয়া লীলা স্বপ্নের কথা ধীরে ধীরে বলিল—বলিতে বলিতে তাহার মুখ কখন ফুল্ল, কখন ম্লান, কখন একেবারে মসীমাখা হইল—বুক ধড়-ফড় করিতে লাগিল। শেষে একটা টানা নিশ্বাস ত্যাগের সহিত কাহিনী শেষ করিল।

বামা লীলাবতীর ভাবান্তর পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল ; সংপূর্ণ না বুঝিলেও তাহার প্রাণের গুপ্ত কথা অনেকটা অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু এত দূর যে গড়াইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। এখন যাহা শুনিল, তাহাতে বামার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সে আকাশ-পাতাল কতই ভাবিল; ভাবিল, তাহার সইএর এ রোগের অন্ত কোথায় ? কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তাহার অত্যন্ত আফ্‌সোস হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল,— কেন সে নিজের মাথা খেয়ে—ঝক্‌মারি ক'রে ঘাটের পথের সেই আলো-করা রূপের গল্প করেছিল ? কিন্তু এখন উপায় ? নদীর প্রবল বেগ কেমনে সামলান যায় ?

উভয়েই দাঁড়াইয়া—নীরব-নিস্পন্দ ! পাতাটী নড়িতেছে তো সেই দুটী নধর নবীনা যুবতী নড়িতেছে না ! আহা, যেন দুইটী চিত্তরঞ্জিনী মোহিনী প্রতিমা !!

হঠাৎ "বৌ কথা কও—বৌ কথা কও" বলিয়া মাথার উপর দিয়া পাখী ডাকিয়া চলিয়া গেল। পাখীর ডাকে উভয়ের চমক

ভাঙ্গিল। "পোড়ার মুখো বেহায়া পাখি, এখানে বৌ কৈ, যে কথা কবে ? মান ভাঙতে কাদের কাছে এইচিস্ ?" বামার এই কথায় লীলার বিষাদ-মাখা মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিল, যেন কালো মেঘে বিজলী চম্‌কাইল। দুঃখের ভিতর বালিকার অন্তরে স্ফূর্ত্তি দিবার জন্য—মন ভুলাইবার জন্য বামার একথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য !

এদিকে সূর্য্য অস্তাচলে গড়াইয়া পড়িল, আঁধার পর্দ্দায় ধরণী ধীরে ধীরে গা-ঢাকা দিল। ব্রাহ্মণী পৈতার সূতা-নাতা গোছাইয়া রাখিয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বলিলেন,—"ওমা ! তোরা কোথায় গা ? ঘরে সাঁঝ-বাতি-ধূপ-ধূনো দিবিনে ?"

মায়ের সাড়া পাইয়া বালিকা চুপে চুপে বলিল,—"সই, আমার প্রাণের ব্যথা, মনের কথা সব-ই শুনলে, আমার পক্ষে থেকো।"

"কেন এ নতুন কথা বল্‌চ সই, আমি কি তোমার ব্যথার ব্যথী নই ? আচ্ছা এর পর কথা হবে খুনি, এখন এস।"

তখন উভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে আসিল, বামা ক্ষিপ্রহস্তে সময়োচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গাজী সাহেবের মাহাত্ম্য

মাসাধিক হইতে চলিল, দরবেশ জাফর খান গাজী সদলবলে ত্রিবেণীতে আসিয়াছেন। ত্রিবেণী নগরীর নিকটস্থ ময়দানে তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছে। ছোট, বড়, মাঝারি গোছের কত রঙের, কত ঢঙের কতই তাম্বু কাতারে কাতারে পড়িয়াছে,—যেন এক খানি গ্রাম বসিয়া গিয়াছে। মধ্যভাগে একটী অশ্বত্থ-গাছের সম্মুখের বৃহৎ তাম্বুটী তাঁহার নিজের। এই তাম্বুর উভয় পার্শ্বে এবং পশ্চাতে তাঁহার সহচর-অনুচর ও পাঁচ হাতিয়ার-ধারী বিশিষ্ট সহযাত্রীদের তাম্বু। তৎপরে সাধারণ লোক ও চাকর-বাকর বস্ত্রাবাস খাটাইয়া বাস করে। ইহার কিছু দূরে অশ্ব, অশ্বতর ও উট থাকিবার আড্ডা। এই সকল পশুর সেবকেরাও তথায় আসিয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে। খাওয়া-দাওয়ার ধুম-ধাম, আমোদ-প্রমোদ, হাসি-খুশী ও সর্ব্বদা বহু লোকের বহু প্রয়োজনীয় কথার কোলাহলে ময়দানটী সর্ব্বদা শব্দায়মান থাকে।

যে দিন ভক্তবীর জাফর খান গাজী সদলবলে ত্রিবেণীর বক্ষে পদার্পণ করিলেন, যে মুহূর্ত্তে গাজী সাহেবের হুকুমে 'আল্লাহো আকবর' ইস্‌লামের এই পবিত্র মধুর বাণী উচ্চকণ্ঠে প্রথম ঘোষিত হইল এবং সেই ধ্বনি বায়ু-ভরে উঠিয়া আকাশের স্তরে স্তরে ছুটিয়া দিগ্‌-দিগন্তরের নর-নারীর প্রাণ-মন

আকর্ষণ করিল, সেই দিনটী কি স্মরণীয়, সেই মুহূর্ত্তটী কি সুখময় ও শুভপ্রদ। প্রথমবারের আজান-ধ্বনি শ্রবণে লোক এমন কিছু খেয়াল করে নাই—ভাবিয়াছিল, নবাগত বিদেশীয় লোকদের কেহ কি জন্য চীৎকার করিতেছে।

কিন্তু একি! আবার সেই ধ্বনি!—আবার সেই ধ্বনি! সূর্য্য কিরণজাল গুটাইয়া লইয়া অস্তাচলে চলিয়াছে, আকাশের গায় কি জানি কোন্ আমোদে কত রকম রং—অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, বাতাস ঝির-ঝির-ঝির বহিয়া দেহ জুড়াইয়া দিতেছে,—এহেন শান্তিভরা সময় আবার সেই ধ্বনি—আল্লাহো আকবর! দেবালয় মুখরিত-করা শঙ্খ-কাঁসর-ঘণ্টার কর্কশ কোলাহল, সন্ন্যাসী-মুখে শিঙ্গা-শাঁখের ভোঁ-ভোঁ শব্দ—এ সকলের ভিতর এ গুরু গম্ভীর আওয়াজ কোথা হইতে উঠিতেছে? কে এ আওয়াজ করিতেছে? আওয়াজটী অতি মধুর, অপূর্ব্ব ও অভিনব। এ আওয়াজ কেহ কখন কাণে শুনে নাই, এ আওয়াজের অর্থ কেহ জানে না—বোঝে না, কিন্তু আওয়াজটী হৃদয়-স্পর্শী বটে।

ত্রিবেণী নগরীর বহু লোক কৌতুহল-বশে আওয়াজ ধরিয়া তাম্বুর অদূরে আসিয়া উপস্থিত। যুবক-বৃদ্ধ-বালক, ইতর-ভদ্র, জ্ঞানী-মূর্খ—কেহ গঙ্গার কূলে বেড়াইতে বেড়াইতে, কেহ কোন স্থানে যাইতে যাইতে, কেহ বা খেলা-ধূলা ছাড়িয়া আসিল এবং যাহা দেখিল, তাহাতে অবাক হইয়া গেল। দেখিল,—বৃহৎ অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলে পশ্চিম-মুখী হইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া আগন্তুকদল কাতারে কাতার দণ্ডায়মান!—স্থির-ধীর-অবিচল!!

সকলেরই গায় রং-বেরঙেব পোষাক, মস্তকেও পোষাক—পাগড়ী-টুপী! সকলেই নীরব, কেবল সকলের আগে দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘকায় সুন্দব পুরুষ মধুব-স্বরে—ভক্তিভবে কি আওড়াইতেছেন। কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! কি সুন্দর ভাব!! দর্শকগণেব ভক্তি উছলিয়া উঠিল—প্রাণ প্রফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিল,—কোন্ দেবতাব দল এই পুণ্য-ক্ষেত্রে আসিয়া গভীব ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন? কোন্ দেবতা এঁরা? দেবতাদের মাথার উপরে কি যেন একটা শান্তির ফোয়ারা ছুটিয়া যাইতেছে, সুগন্ধে চাবিদিক আমোদিত হইয়াছে।

এ কি? হঠাৎ এ আবার কেমন ভাব? এক-ই কায়-দায়, এক-ই প্রকারে, এক-ই সময়েব মধ্যে নম্রভাবে অবনত—উত্থান! অবশেষে ভূতল-লুণ্ঠিয়া মস্তক স্থাপন! ইহা কি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম? কিন্তু কাহাকে প্রণাম? কৈ কোন দেবতার মূর্ত্তি তো সম্মুখে নাই! তবে ইহারা এমন করিল কেন? এ তো কিছুই বোঝা গেল না!! কিন্তু ভাবটী অতি উচ্চ!—অতি মহান্! ইহা প্রেম-ভক্তি, ধৈর্য্য-নম্রতা ও একতার পরিচায়ক! এ দৃশ্য দেখিলে কাহার মন না গলিয়া যায়! অবাক নয়নে চাহিয়া দর্শকের দল এইরূপ কত কি ভাবিতে লাগিল।

নামাজ সাঙ্গ হইল। অনেক নামাজী নম্রভাবে তাম্বুতে গমন করিলেন। কেবল সেই অগ্রবর্ত্তী পুরুষ, শাহ্ জাফর খান গাজী, সর্দ্দাব সাহেব, সমশের শর্ম্মা এবং অন্য কতিপয়

ব্যক্তি নয়ন মুদিয়া তস্‌বীহ্‌ জপিতে লাগিলেন। দর্শকদের মধ্যে অনেকে চলিয়া গিয়াছিল; যাহারা ছিল, তাহারা এই ব্যাপারের মূলানুসন্ধান করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

যথাসময়ে তস্‌বীহ্‌ জপ শেষ করিয়া গাজী সাহেব সেই সমাগত লোকদিগকে বসিতে বলিলেন, কিন্তু কেহ বসিল না। এক জন বলিল,—"আপনাদের এরূপ করার উদ্দেশ্য কি? আমরা কিছুই বুঝতে পারলেম না!"

গাজী সাহেব ইহা শুনিয়া সমশের শর্ম্মার দিকে তাকাইলেন।

শর্ম্মা গাজী সাহেবের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া প্রশ্ন-কর্ত্তাকে বলিলেন,—"ইহা আমাদের আল্লার উপাসনা—খোদার পূজা। তোমরা যাঁকে ঈশ্বর, ভগবান বা ব্রহ্ম বল, আমরা তাঁকে বলি আল্লাহ্‌ বা খোদা।"

প্রশ্ন-কর্ত্তা বলিল,—"আল্লা? ঈশ্বরকে বল তোমরা আল্লা? তা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এই ত্রিবেণীতে অনেক ঠাকুর-বাড়ী আছে। সেখানে ভগবান সশরীরে বিরাজ কচ্চেন, আমরা সেই ভগবানের পূজা করি—মানসা জানাই, তা তোমাদের আল্লা এখানে কৈ?"

সমশের শর্ম্মা ইহা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"ভগবানের কি শরীর আছে? ভগবান যে নিরাকার। তিনি নিরাকার-রূপে সব ঠাঁই আছেন, আমাদের এখানেও আছেন—এখানেও নিরাকার আল্লা বিরাজ কচ্চেন। মানুষের চোখে তাঁকে দেখা যায় না—কেউ তাঁরে কোন কালে দেখেও নাই। তাঁর কেমন রূপ, তা কেউ জানে না। তোমরা যে একটা মন-গড়া মূর্ত্তি

তৈরী করে তারেই ভগবান ব'লে পূজা করো—আবার খাবার খেতে দাও, সেটা তোমাদের মস্ত ভুল। ভগবানের কি ক্ষিদে আছে? আমরা সেরূপ করি না—আমরা নিরাকার আল্লারই পূজা করি।"

প্রশ্নকারী ইহা শুনিয়া নীরব হইল। মনে মনে বলিল,—"ইনি যা বল্‌লেন. বেশ মনে ধরিল। আমাদের এ রকম পূজো-টুজো তবে কোথা হ'তে এল?"

সেই সব লোকের সঙ্গে তামাসা দেখার অছিলায় দুই জন ভিখারীও আসিয়াছিল। তাম্বুর সাজ-সরঞ্জাম, তাম্বুবাসীদের চেহারা আর ধুম-ধাম দেখিয়া এক জন তাহার সঙ্গীকে বলিল,—"ভাই. ভিক্ষেয় তো বেরিয়েচি, এদের কাছেও চেয়ে দেখি, যদি কিছু মেলে! মেলে তো ভালই মিল্‌বে।"

"আরে তুমিও যেমন, এরা কি কিছু দেবে, মিছে বাক্যি খরচ ক'রে লাভ কি?" বলিয়া সঙ্গীটী অনিচ্ছায় দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রথম ভিখারী বলিল,—"ওহে সব ঠাঁই কি চেয়ে মেলে? দেখাই যাক্—আমাদের মুখের কথা বৈ তো নয়! খাটা-খাটুনি তো কিছু করতে হচ্চে না!" বলিয়া অগ্রে গিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল।

সমশের শর্ম্মা গাজী সাহেবকে ভিখারীদের প্রার্থনা জানাইলেন। গাজী সাহেব দেখিলেন, ভিখারীদের পরণের কাপড় অতি ছোট—শরীর অনাবৃত। এ দেশের ভিখারী-বৈষ্ণবদের পোষাকই যে এইরূপ—তারা আধ-লেংটা, তা তো তিনি জানেন না। তিনি ভাবিলেন,—কাপড়ের অভাবেই

বুঝি এদের এই দশা। তাই তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে পাঁচটী টাকা দিয়া কাপড় কিনিতে বলিলেন।

ভিখারীরা আশার অতিরিক্ত—জীবনে যা কখন পায় নাই—দান পাইয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইল। এক জন বলিল,—"দেখ্‌লি—বাবার কালে যা ভাগ্যে ঘটেনি, তাই ঘট্‌ল। এই ত্রিবেণীতে লক্ষপতি, ক্রোড়পতি কতই আছে, কত বাবু-ভেয়ে মোটা মোটা দেহ নিয়ে নিজেরাই খায়—মজা ওড়ায়, কাঙ্গালকে কে এমন দেয় রে? কাঙ্গালের পানে কে চায়? আহা, এদের কি দয়ার শরীর! ভগবান এদের মঙ্গল ক'রবেন।"

ভিখারীদ্বয় এইরূপ বলা-কহা এবং গাজী সাহেবের শত মুখে প্রশংসা করিতে করিতে ত্রিবেণীর বাজারের দিকে প্রস্থান করিল।

উপস্থিত লোকেরাও গাজী সাহেবের দান দেখিয়া অবাক্। যেখানে দুই একটী পয়সা দিলেই যথেষ্ট, সেখানে পাঁচটী টাকা দান! এ বড় কম কথা নয়। তাহারা বুঝিল,—এই ভিন্ন বেশধারী বিদেশীয় ব্যক্তিগণ কেবল ধার্ম্মিক নহেন, ইহাঁরা দাতা, দয়ালু এবং পরোপকারী। এইরূপ বলা-কওয়া করিতে করিতে তাহারাও স্ব স্ব স্থানে গমন করিল।

এই সমস্ত লোকের এবং ভিখারীদ্বয়ের মুখে ধর্ম্মপ্রাণ জাফর খান গাজীর সুনাম নগরময় প্রচারিত হইল। তৎপর দিন হইতে প্রত্যহ বহু অক্ষম, অন্ধ, খঞ্জ, ভিখারী তাম্বুর চারিদিকে জমিতে লাগিল; ভিখারীদের কোলাহলে ময়দানটী উৎসবময় হইল। দয়ালু গাজী সাহেবও সকলকেই প্রভূত পরিমাণে দান-

খয়রাত করিয়া তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অনেক কৌপীন-ধারী সাধু-সন্ন্যাসীও আসিয়া ঘি-ময়দার যোগাড় করিতে ত্রুটি করিল না।

এক দিন একটী দুঃখিনী রমণী একটী ছেলে কোলে করিয়া তাম্বুর দুয়ারে উপস্থিত। রমণীর পরিধানে এক খানি ময়লা ছেঁড়া কাপড়, শরীর ক্ষীণ, মুখ মলিন; তাহার ছেলেটীও জীর্ণ-শীর্ণ! শিশুর পেটের হাড় ক-খানা জির্ জির্ করিতেছে, চক্ষু কোটরগত, লম্বা লম্বা হাত-পায়ে চামড়া আছে মাত্র। মাতা-পুত্রের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়ালু গাজী সাহেবের দয়ার সাগর উথলিয়া উঠিল। তিনি দুঃখিত-ভাবে শর্ম্মা ঠাকুরকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন।

শর্ম্মা বলিলেন,—"মা! তোমার এ-হাল কেন?"

রমণী কাতরকণ্ঠে নিজের দীনতা জানাইয়া কহিল,—"বাবা, আমার পেটে কিছু তলায় না, খেলেই বমি হয়, পেট ভুট-ভাট করে, বুক জ্বলে আর পাতলা দাস্ত হয়। আমার দেহ ভার-বোঝা—হাঁটিতে গেলে হাঁপ লাগে। আমার ছেলেটীও মর-মর,—দেখ্‌তেই পাচ্ছেন। এই দেখুন এর দুই কোঁক-জোড়া পাত-পীলে।"

শর্ম্মা। তুমি কাঙ্গাল, কিন্তু ত্রিবেণীতে অনেক ধনী আছেন, অনেক কবিরাজ-বদ্দি আছেন, তাঁরা কেউ দয়া ক'রে ঔষধ দিয়ে তোমার ছেলেটীরে আরাম করে না?

"কেউ না বাবা, কেউ না, কেউ কাঙ্গালের পানে চায় না। অনেকেই মুখ-ঝামটা মেরে আকথা-কুকথা বলে। যাদের

একটু দয়ার শরীর, তারা বলে,—ও রোগের ওষুধ ঠাকুরদের পাদক জল আর সাধু-সন্ন্যাসীদের গাছ-গাছড়া ; তা ছাড়া আর ওর ওষুধ নেই। তা বাবা, ঠাকুরদের পা-জল আর সন্ন্যাসীদের গাছ-গাছড়া এ যে কতই খেয়েচে, তা আর বল্‌বার নয়। কিছুতেই কিছু হল না ; বাছার আমার রোগ সারল না।” কাঙ্গালিনী ইহা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গাজী সাহেব রমণীর কাতরতা দেখিয়া বলিলেন,—“মায়ি! কেঁদনা। একটা লোটা ভ’রে দরিয়া থেকে জলদী পানি আন।”

রমণী প্রাণের দায়ে ছেলে কোলে লইয়া সাধ্যমত বেগে গঙ্গার দিকে ছুটিল। কাঙ্গালিনী পিতল বা অন্য ধাতু-পাত্র কোথায় পাইবে ? তাহার সঙ্গে একটী নারিকেলের মালা ছিল, সে সেই মালা ভরিয়া পানি আনিয়া গাজী সাহেবের সামনে হাজির করিল।

গাজী সাহেব মুদিত-নয়নে সেই মালার পানিতে তিনটী ফুৎকার দিয়া বলিলেন,—“এই পানি তিন দিন রাত্রিকালে তুমি খাবে আর তোমার ছেলেকে খাওয়াবে। আল্লার দোওয়ায় বেয়ারাম সেরে যাবে। আর এই টাকা দুটী নিয়ে তুমি কাপড় কেনগে।

সাধু-হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য শক্তি! সাধু বাক্যের কি অপূর্ব্ব মহিমা!! যে রোগ কলসী-কলসী দেবতার পাদোদক পানে, সন্ন্যাসী-প্রদত্ত বহু ঔষধে সারে নাই, আজ তাহা পুণ্যাত্মা জাফর খান গাজীর পবিত্র মন্ত্রপূত পানি-পানে এক দিনেই অর্দ্ধেক সারিয়া গেল, দ্বিতীয় দিনে বাকিটুকু, তৃতীয় দিনে মাতা-পুত্র

একেবারে নীরোগ—শরীর ঝর-ঝরে ও বলসম্পন্ন হইয়া উঠিল—মনে স্ফূর্ত্তি পাইল। আর সে পেটের ভুট-ভুটানি নাই, আর সে জড়তা-বিষণ্ণতা নাই! আহা, কাঙ্গালিনীর অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভাঙ্গিয়া পড়িল! প্রতিবাসী নর-নারী কাঙ্গালিনীর প্রফুল্লতা দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে কাঙ্গালিনী গাজী সাহেবের দরবারে আনন্দে পুত্র লইয়া হাজির। কে বলে তাহাদের রোগ হইয়াছিল? রোগের চিহ্নও তাহাদের দেহে নাই। কাঙ্গালিনী গাজী সাহেবের পদতলে ছেলেকে ফেলিয়া দিয়া সজল নয়নে কহিল,—"আপনার দয়াতে এর প্রাণ রক্ষা হয়েছে—আমিও সেবেচি, এখন এ ছেলে আপনারই।"

গাজী সাহেব হাস্যমুখে বলিলেন,—"দূর দেওয়ানা বেটি! আল্লার দয়াতেই তোর ছেলে আরাম হয়েছে। এ জানবি আল্লার মহিমা! এ ছেলে আমিই নেব—কিন্তু এখন নয়, তুই এখন মানুষ করগে যা। যখন যা দরকার হবে, আমাকে জানাবি। এখন এই টাকা নিয়ে নিজেদের খাবার-দাবার কিনগে যা।"

কাঙ্গালিনীর আনন্দের সীমা রহিল না। মনে মনে ভাবিল,—"ঈশ্বর এই দেবতার দয়ায় আমাদের প্রাণ-রক্ষা ও প্রাণ-ধারণের উপায়, দুই-ই করিয়া দিলেন।"

আর এক দিন প্রভাত-কালে গাজী সাহেব নামাজ সাঙ্গ করিয়া বসিয়া আছেন, সহচর-অনুচরগণ কেহ উপবিষ্ট, কেহ দণ্ডায়মান, এমন সময়ে একটী লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে

আসিয়া তাড়াতাড়ি বলিল,—"আপনাদের এট্টু দয়া—একটু ছি-চরণ, একবারটী ছি-চরণ দিতেই হবে। মোর পরিজনকে সাপে ডংশেচে, ঢুলে পড়েচে, তার মুখে নালি ভাংচে গো! এট্টু শীগ্গীর দয়া ক'রে যেতে হবে।" বলিয়া লোকটী কাঁদিয়া ফেলিল।

লোকটীকে গায়-ময় ব্যস্ত দেখিয়া শর্ম্মা ঠাকুর বলিলেন,—"আরে স্থির হও, তোমার বাড়ী এখান থেকে কত দূর?"

"আগ্গে ঐ যে, ঐ দেখা যাচ্ছে, ঐ গাছ্গুলোর ও-বাগে—সরস্বতীর ধারে। আগ্গে মুই বংশীদাস কৈবর্ত্ত! এট্টু দয়া কত্তেই হবে?"

"কৈবর্ত্তের পো, থামো—বলি, আমরা গেলে তোমার কি উপকার হবে?"

"আগ্গে খুব হবে—খুব হবে গো—মুই তোমাদের গুণের গপ্প নোকের ঠেন্ ঢের শুনিচি গো, চল।"

"আচ্ছা, আমরা গেলে যদি তোমার উপকার হয়, তবে এক্ষণি যাচ্ছি।" ইহা বলিয়া শর্ম্মা ঠাকুর গাজী সাহেবকে অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন।

বংশীদাসের তখনো মুখ বন্ধ হয় নাই।—"ওগো এট্টু তরন্ত চল গো—সে বুঝি আর বাঁচল না। এট্টু দয়া করো।" এইরূপে বকিতেছিল।

"চল—আজ ঐ দিকেই যাওয়া যাক্" বলিয়া গাজী সাহেব গাত্রোত্থান করিলেন। মেঠো রাস্তা—সরল ও সুগম নহে।

বংশীদাস অগ্রে অগ্রে দ্রুত চলে, এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে আর বলে,—"আর এট্টু—ঐ দেখা যাচ্চে।"

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে গাজী সাহেব শর্ম্মা ঠাকুর ও আর কয়েক জনের সঙ্গে বংশীদাসের বাড়ী পৌঁছিলেন। বংশীর এক খানি বাসের ঘর, আর এক খানি ছোট্ট গো-শালা। বাসের ঘরের দেওয়াল ফাটা, স্থানে স্থানে হেলিয়া পড়িয়াছে। ঘরের পশ্চাতে বাঁশের ঝাড়, ঘরের আশে-পাশে জঙ্গল ও ভাঙ্গা হাঁড়ী-কলসীর গাদা। উঠানের এক দিকে গোবরের রাশি—পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। ঘর-বাহির অপরিষ্কার—অপরিচ্ছন্ন!

বংশীর উঠানে লোকে লোকারণ্য—স্ত্রী-পুরুষ বহু লোক জড় হইয়াছে, নানা কথা বলিতেছে। ঘরের দাওয়াতেও স্ত্রী-পুরুষ-ভরা, এক জন ওঝা উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পড়িয়া বংশীর স্ত্রীকে ঝাড়াইতেছে।

গাজী সাহেব ও তৎসঙ্গীরা নাকে রুমাল দিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন—তাঁহাদের আগমনে সকলেই আশ্বস্ত হইল। গাজী সাহেব বলিলেন,—"তফাত করো ঐ সব লোকদের।" এই কথায় রোগিণীর কাছ হইতে সকলেই উঠানে নামিল, কেবল সেই ওঝা আর একটী স্ত্রীলোক রোগিণীর মুখের কাছে বসিয়া রহিল। ওঝার মুখ ইতিপূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল।

তখন শর্ম্মা ঠাকুর গাজী সাহেবকে লইয়া দাওয়ায় উঠিলেন। বংশী কেন যে অত ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়াছিল, শর্ম্মা ঠাকুর এখন বুঝিলেন। বংশীর স্ত্রী যুবতী—খুব সুন্দরী। কৈবর্ত্তের ঘরে—বিশেষ চাষার ঘরে এমন রূপ—এমন গড়ন-পিটন খুব কমই

হইয়া থাকে। গাজী সাহেব দাওয়ায় উঠিয়া দেখিলেন,—রোগিণী বেহুঁশ, সটান হইয়া পড়িয়া আছে, নাকে দম পড়িতেছে। তাহার আলু-থালু কেশ এবং হাত, মুখ, পিঠ অনাবৃত। তিনি দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। "কি বে-ইজ্জতী! এরা কি সবাই বে-ওকুফ্?" বলিয়া বংশীকে ঢাকিয়া দিতে বলিলেন। মূর্খ বংশী সে কাজ না করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল,—"এই দেখ, এই হাতে ডংশেচে—এই কাটিন দাগ। বিষ উঠ্‌বে ব'লে এই বেঁধে দিইচি।"

"খোলো জল্‌দী ঐ বাঁধা, আর গায় কাপড় দিয়ে দাও," গাজী সাহেবের এই ধমকে অগ্রে রমণীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া দিল এবং বন্ধন খুলিয়া দিল। ওঝা বা অন্য কেহ আপত্তি করিতে সাহস করিল না। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষ পবিত্র মুখে আল্লার পবিত্র কালাম পড়িয়া রমণীর দংশন-স্থানে ও মস্তকে একবার ফুৎকার প্রদান করিলেন। বিধাতার ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ তাহার হুঁশ হইল—অবসাদ কাটিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া মুখে কাপড় টানিয়া দিল,—পা দুইটী গুটাইয়া জড়-সড় হইয়া শুইল।

গাজী সাহেব রোগিণীর এই অবস্থা দেখিয়া সুখী হইলেন। "আর ভয় নাই, উহাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ খেতে দাও, আর গরম পানিতে ঘা ধোওয়াও" বলিয়া সদলবলে প্রস্থান করিলেন। যুবতী বাঁচিয়া গেল, বংশীদাস কৈবর্ত্তেরও অবসন্ন দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল।

সাধু-পুরুষ আপনার সাধুতা—সাধনার বিস্ময়কর মহিমা

দেখাইয়া প্রস্থান করিলেন। সমবেত জন-মণ্ডলীর অন্তরে যে চমক লাগাইয়া গেলেন,—প্রেম-ভক্তির যে অনাবিল স্রোত বহাইয়া গেলেন, সে চমক আর ভাঙ্গিল না—সে স্রোত আর থামিল না, কোন কালেও থামিবে বলিয়া বোধ হয় না। তাবত লোক অবাক্ হইয়া বলা-বলি করিতে লাগিল,—"কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তিন ঘণ্টা ধ'রে কত ঝাড়ান-কাড়ান ক'রে—কত ওষুধ খাইয়েও যে বিষ নাবল না, সে এক ফুঁতেই জল হয়ে গেল!! সাবাস্ ক্ষমতা! ধন্য এই সাধু পুরুষ, ধন্য তাঁর মানব-জন্ম!! তাঁর পায়ের ধূলোয় এই ত্রিবেণীও ধন্য—পবিত্র হ'ল। এমন সাধু পুরুষ এই ত্রিবেণীতে আর কেউ আসেন নি।"

ফলতঃ দান-খয়রাত, পরোপকার ও অদ্ভুত কার্য্য-পরম্পরায় গাজী সাহেবের সুখ্যাতির ডঙ্কা বিশাল ত্রিবেণী নগরী ও চারি-দিকের পল্লীসমূহে বাজিয়া উঠিল। অনেকে তাঁহার অনুগত ও ভক্ত হইয়া পড়িল। এখন গঙ্গার কূলে বেড়াইতে গেলে অনেক ধ্যান-রত সন্ন্যাসীও তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহেন, কেহ কেহ তাঁহাকে সালাম দিয়া তাঁহার সহিত সদালাপ করিতেও প্রয়াস পাইয়া থাকেন।
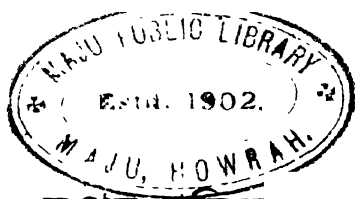
সপ্তম পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসীদের ক্রোধ

ত্রিবেণীতে আসিয়া অবধি গাজী সাহেব ও তৎসঙ্গীগণ নীরবে অলসভাবে তাম্বুর ভিতরে বসিয়াই কাল কাটাইতেছেন না। তাঁহারা দুই চারি জনে এক একটা দল বাঁধিয়া এক এক দল এক এক দিকে গিয়া পল্লীবাসীদের আচার-ব্যবহার, পোযাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম্মভাব ও অপর কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। আর কোন কোন বিষয়ে কাহারো কাহারো সাহায্য করিয়া আনন্দে বাস করিতেছেন। কোন কোন স্থলে ধর্ম্মের কথাও বলিয়া সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন। ধর্ম্ম-প্রচার সঙ্কল্প তাঁহাদের অন্তরে জাগিয়াই আছে। এইরূপ নিয়মে তাঁহাদের দৈনিক জীবন অতিবাহিত হইতেছে।

গাজী সাহেবের ভ্রমণের সঙ্গী, সমশের শর্ম্মা ও মোস্তফা খান বোখারী। কোন কোন দিন আরও কেহ কেহ তাঁহাব অনুসরণ করিয়া থাকেন। যুবক মোস্তফা খান গাজী-সাহেবের খুব প্রিয়। এই যুবক দেখিতে যেমন সুন্দর, তাঁহার চরিত্রও তেমনি নির্ম্মল ধর্ম্মভাবে ভরা। তিনি তেজস্বী, চতুর, কার্য্যপটু এবং গাজী সাহেবের পরম ভক্ত। পাঠক! মোস্তফা খান বোখারীকে আপনি ইতিপূর্ব্বে একবার দেখিয়াছেন, মনে পড়ে কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ত্রিবেণীর গঙ্গা-তীরে, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের অধিকৃত সেই নিরিবিলি রমণীয় স্থানটী গাজী সাহেবের বড়ই পসন্দ! উহা সাধনার অনুকূল স্থান, ইহা প্রথম দিন দেখিয়াই তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি সকালে-বিকালে এ-দিক ও-দিক ক্ষণকাল বেড়াইয়া এই খানে আসিয়া অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। সম্মুখে এবং পার্শ্বে উদার জলস্রোত ছোট বড় ঢেউ তুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া বহিয়া যাইতেছে, তীরে দূর্ব্বা-দলাবৃত হরিৎ ভূমি! তাহার উপরে স্থানে স্থানে অশ্বত্থ-বট-দেবদারু বৃক্ষ দণ্ডায়মান,—অশোক, বকুল, কদম্ব তরুও আছে। তরুশির দোলাইয়া শীতল বাতাস ঝির-ঝির করিয়া এখানে সদাই বহে, শরীর জুড়াইয়া দেয়। এখানে আসিলেই গাজী সাহেবের অন্তর আনন্দে ভরিয়া যায়—প্রাণে কতই সুখ-বোধ করেন। তাঁহার পদার্পণেও স্থানটী যেন কি এক অপার্থিব শান্তি এবং সাত্ত্বিক ভাবে ভাসিয়া উঠে।

এই ভূমির কোন কোন যোগরত সন্ন্যাসী গাজী সাহেবের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে এক জন মহাসাধু বোধে ফুল্ল-মুখে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। আবার কোন কোন ক্ষুদ্রচেতা তপস্বী মুসলমানের মুখ-দর্শন করিলে নিজেদের তপোবিঘ্ন ঘটিবে, ভাবিয়া ঈর্ষাবশে বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইতেন। পরন্তু গাজী সাহেব যে প্রকৃত সাধন-পথে চরম অগ্রসর,—যথার্থ ধর্ম্মাচারী সিদ্ধ তাপস, তাহা সেই ভ্রান্ত পথানু-সারী ভণ্ড যোগীরা কিরূপে বুঝিবে?

এক দিন কতিপয় ক্ষুদ্রচেতা সন্ন্যাসী মহারুষ্ট হইয়া পরামর্শ

করিলেন,—"এই তপোবিঘ্নকারী মুসলমানদিগকে না তাড়াইলে আর ধর্ম্ম থাকে না; এখানে উহাদের আসা বন্ধ করিতেই হইবে। উহাদের মুখ দেখিয়া আমাদের তপ-জপের বিঘ্ন তো ঘটেই, তাহা ছাড়া আরো হানি আছে। ঐ যে গাজী-হাজী না শাজি ব'লে মুসলমানটা—লোকটা মায়াবী কি তা জানিনা,—ওর অদ্ভুত ক্রিয়ার কথা দিন দিন যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, দিন দিন তার ভক্তের সংখ্যা যেরূপ হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে সে এখানে একটা কাণ্ড না করিয়া বসে। ভগবান এ বালাই আবার কোথা হইতে এখানে আনিলেন।"

ইহা শুনিয়া আর একটী ভণ্ড যোগী কপাল কোঁকড়াইয়া বলিল,—"কেবল কথায় কি কাজ হবে?"

তখন অন্য এক জন কৌপীনধারী দন্তে মুখখানা উচ্চ করিয়া বলিল,—"সহজে না হয়, শেষে নিদেন অস্ত্র—ব্রহ্ম-শাপ! ব্রহ্ম-শাপে কি আর নিস্তার আছে? অভাগা জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবে—যেমন কাজ, তেমনি দণ্ড পাবে।"

"উত্তম—উত্তম! শেষে সেই নিদানের নির্ঘাত বাণ ছাড়লেই সব জঞ্জাল চুকে যাবে; টের পাবে,—হিন্দুর ব্রহ্মশাপ কি ভয়ানক—কেমন অব্যর্থ!"

এই পরামর্শ করিয়া সেই কুচক্রী সন্ন্যাসীরা অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর গাজী সাহেব প্রত্যহ যেমন-সময়ে অভ্যাস-মত আসিয়া থাকেন, সেইরূপ দুই জন সঙ্গীর সহিত উপস্থিত হইলেই সেই কয় জন সন্ন্যাসী তাঁহাদের নিকটে আসিল। এক জন বলিল,—"আপনারা রোজ-রোজ কি জন্য এখানে

আসেন ? কি কাজ আপনাদের এখানে আছে, যে, রোজ না আসিলেই নয় ?"

গাজী সাহেব বলিলেন,—"আপনাদের এই জায়গাটা আমার বড়ই ভাল লাগে, তাই রোজ রোজ আসি।"

ইহা শুনিয়া এক জন দুষ্ট সন্ন্যাসী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—"না, আর ভাল লাগ্‌বার দরকার নেই, আর এখানে তোমরা এস না। মুসলমানের মুখ দেখ্‌লে আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম হয় না—সব অনুষ্ঠান পণ্ড হয়। তোমরা এখান এখান থেকে চলে যাও।"

তেজস্বী মোস্তফা ইহা শুনিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"কি ! চ'লে যাব ?"

মোস্তফার 'চলে যাব ?' কথা উচ্চারণমাত্র গাজী সাহেব 'চুপ রহো' বলিয়া সন্ন্যাসীদিগকে বলিলেন,—"গোঁস্বা কর্‌বেন না, সাধুদের কি গোঁস্বা সাজে ?"

এক জন সন্ন্যাসী বলিল,—"সে উপদেশ আর দিতে হবে না।"

গাজী সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা নাই দিলাম, কিন্তু আমরা যে এই ঠাঁই বস-বাস কর্‌তে এরাদা করেছি। এ জায়গা ছেড়ে আমরা যেতে পারব না। যদি আপনাদের অসুবিধা হয়,—আমাদের মুখ দেখ্‌লে আপনাদের তপোবিঘ্ন হয়, তবে আপনারাও তো আর কোথা যেতে পারেন—দরিয়ার দু-ধারে তো ঢের জায়গা পড়ে আছে !"

"কি ! এ স্থান আমরা ত্যাগ কর্‌ব ? স্পর্দ্ধা তো কম নয় ?"

আমরা পাপ-তাপ-হারিণী পতিতপাবনী গঙ্গা-মাতার উপাসক, এই পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীর এই পবিত্র স্থানে আমরা যুগযুগান্তর ধ'রে গঙ্গা-মাতার তপস্যা কর্‌চি—মায়ের ভক্ত সন্তান আমরা,—আমরা যাব ?"

ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু করিয়া রুক্ষস্বরে ইহা বলিয়া সন্ন্যাসীবা গাজী সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। গাজী সাহেব বিকাররহিত—শান্ত মূর্ত্তি, যেন স্থির গম্ভীর হিমগিরি! প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষ কি কাহারও রূঢ় কথায় রুষ্ট হইতে পারেন ? না, তাঁহাদের ক্রোধ আছে ?

এই সময়ে শমশের শর্ম্মা কোমল স্বরে বলিলেন,—"আপনারা এই স্থানে বহু দিন ধরিয়া আছেন সত্য, কিন্তু এক স্থানে যে চিরদিনই থাকিবেন, তাহার প্রমাণ কি ?

"যথা হি পথিকঃ কশ্চিচ্ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি,
বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেত্তদ্বদ্ভূত সমাগমঃ।" *

ইহা কি আপনারা জানেন না ? চিরকাল এক জায়গায় তো থাকিতে কেহ আসে নাই ! আর

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ,
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।"

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়, নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ ধর্ম্মের যে এই দশটী লক্ষণ সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিতও নহে, শোভনও দেখায় না।"

* যেমন পথিক বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া পুনঃ গমন করে, জীবদের সমাগমও সেই প্রকার।

সন্ন্যাসীরা ইহা শুনিয়া অবাক্! এমন জ্ঞানের কথা যাহার মুখে, সে তো সামান্য লোক নয়। ইহা ভাবিয়া শর্ম্মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—কথা কহিতে পারিলেন না। কতক্ষণ পরে এক জন সন্ন্যাসী উচ্চকণ্ঠে নিজ সঙ্গীদিগকে বলিল,—"আরে দেখ্‌চ না, এরা বিবাদ বাধাতে এসেছে। অসুরেরা চিরকালই বিবাদ বাধায়—তপস্যার বিঘ্ন ঘটায়। এখন দেখ্‌চি রাজা-রাজড়ার সাহায্য ভিন্ন এ আপদ দূর হবে না। রাজারাই যোগী-ঋষিদের তপ-জপের বাধা-বিঘ্নহারী—আশ্রমের শান্তি-রক্ষার সহায়।"

মোস্তফা ইহা শুনিয়া আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীদের কটু কথায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তেজের সহিত বলিলেন,—"বোলাও তোমাদের রাজ-রাজড়াদেব; মুসলমান আল্লাহ্‌ বিনা আর কাহাকেও ডরায় না—আল্লাই মুসলমানের সহায়।"

গাজী সাহেব নরম সুবে অথচ তেজের সহিত বলিলেন,—"বিবাদেব দরকার? আল্লাব মর্জ্জি হ'লে বিনা বিবাদে এ জায়গাটা আমরা পাব। এখানে আল্লার মস্‌জিদ বানিয়ে সেই দয়াময় এলাহির বন্দেগী ক'রে আব এ মুলুকের আওরত-মর্দ্দের দেল ইস্‌লামেব নূরে রওশন ক'রে মানুষকে খাঁটি মানুষ বানাব। এ ছাড়া আমাদের আর কোন খাহেশ নেই।"

"উঃ কি দুরভিসন্ধি! কি বিষম দুরাশা! এরা ইটের আঘাতে পাহাড় ভাঙ্গ্‌তে চায়।"

এক জন সন্ন্যাসী বিকৃত স্বরে এই কথা বলিলে গাজী সাহেব কহিলেন,—"দুরাশা আমাদেব নয়,—যারা মিছে কাজে

রাত-দিন প'ড়ে থেকে ইহ পরকাল নষ্ট করে, অকারণে বাদলা-তুফানে কষ্ট পায়, দুরাশা তাদের। আল্লার হুকুমে ত্বরায় আমাদের আশা পূর্ণ হবে, এ জায়গা তাদের ছেড়ে যেতে হবে।"

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসীর দল আরো রোষান্বিত হইল—তাহাদের নয়ন হইতে যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। কর্কশ কণ্ঠে কহিল,—"আমরা এখানে মিছে কাজে আছি? হা-হা-হা! দেব-দেবীর মহিমা যারা জানে না,—গঙ্গার মহিমা বোঝে না, সেই বর্ব্বরদের মুখে এ কথা শোভা পায় বটে! সে মূঢ়েরা কি ভেবেছে, এই পবিত্র সাধন-ভূমি আমরা ত্যাগ ক'রে যাব? ভক্তের প্রাণের জিনিস অভক্ত বর্ব্বরকে দেব! কখনই না—জীবন থাক্‌তে এ মাতৃ-কোল আমরা ছাড়ব না। যত দিন সেই পতিত-পাবনী নারায়ণী সদয় না হন, যত দিন সেই মকর-বাহিনী দ্রবময়ী মা গঙ্গার দর্শন না পাব, ততদিন ভক্তিপূর্ণ মনে আমরা এই স্থানে থাকিয়াই তাঁর অর্চ্চনা ক'রব, 'মা-মা মাতর্গঙ্গে' ব'লে ডেকে মায়ের আসন টলাব—মায়ের পবিত্র মূর্ত্তি দেখে জীবন সার্থক ক'রব।"

সন্ন্যাসীরা ক্রোধের বশে ইহা বলিয়া নীরব হইল। তখন তত্ত্বদর্শী গাজী সাহেব তাহাদের অধর্ম্ম—অন্ধ বিশ্বাস দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন—আর কথা কহিলেন না।

মোস্তফা বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, জলদী তোমরা গঙ্গা-মাতার সাক্ষাৎ পাবে—মায়ের কোলে প্রাণ জুড়াবে।"

গাজী সাহেব আর বিতণ্ডায় কাজ নাই মনে করিয়া সঙ্গীদ্বয়কে লইয়া তাম্বুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুই দিকে দুই দৃশ্য

আজ আসরের নামাজ পড়িয়াই গাজী সাহেব তাম্বু হইতে বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে মুফ্‌তী সাহেব, মোস্তফা খান বোখারী আর এক জন প্রৌঢ়বয়স্ক পাঠান. সর্দ্দার। আজ শর্ম্মা ঠাকুর সঙ্গে নাই—শর্ম্মা ঠাকুর পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইয়া চারি দিন হইল পাণ্ডুয়ায় নিজ বাড়ীতে গিয়াছেন। আজ তাঁহার ফিরিবার কথা; তিনি না আসায় গাজী সাহেব কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

ধীরে ধীরে পায়চারী করিতে করিতে গাজী সাহেব সহচরদ্বয় সহিত সন্ন্যাসীদের সাধন-ভূমির নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, সন্ন্যাসীরা নিজ নিজ স্বভাবসিদ্ধ কাজে মগ্ন—কেহ সদ্য আরাম-দায়িনী গঞ্জিকা দেবীর সেবায় মত্ত, কেহ ধূনি জ্বালিয়া চক্ষু মুদিয়া বিড় বিড় করিতেছেন, কেহ মৃগ চর্ম্মের উপরে মুদ্রিত নয়নে চিত হইয়া সটান, কেহ বা বৃহৎ চিমটার দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের উপরে খোঁচা মারিতেছেন। কেহ গলদেশে পিত্তলের ক্ষুদ্র হাওদায় কতকগুলি শিলাখণ্ড ঝুলাইয়া হাতে শুষ্ক অলাবু-সঞ্জাত পাত্রে খাদ্য-সামগ্রী লইয়া নগর মধ্য হইতে আগত, কেহ কেহ গমনের উদ্যোগ-পর্ব্ব আরম্ভ করিতেছেন। অনেকে আবার হেঁটমুণ্ডে বসিয়া ইষ্ট মন্ত্র ধ্যান করিতেছেন। নগর হইতে দুই এক জন নর-নারী পরপ্রদত্ত আহার্য্যে পরিপুষ্ট

জী   হরের আস্তানার মধ্যস্থ মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ
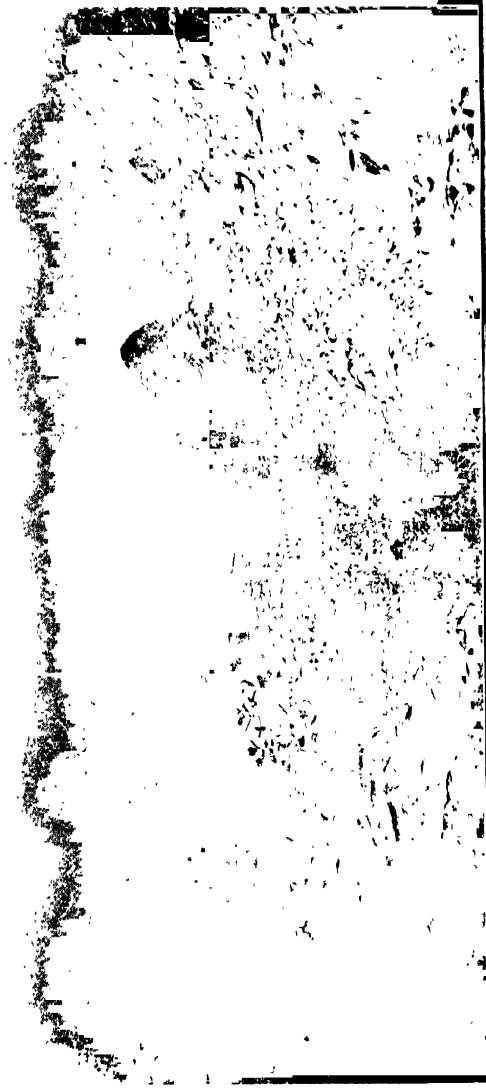
জটাধারীদের কৃপা-ভিখারী হইয়া ভূতল লুণ্ঠিয়া প্রণাম পূর্ব্বক যুক্তকরে দণ্ডায়মান আছে। গাজী সাহেব যখনই আসেন, তখনই এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পান, দেখিয়া তাঁহার মনে অনুতাপ হয়, মনে মনে খোদাওন্দ-তা'লার নিকট বলেন,—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের কি ধর্ম্মের দিকে ইমান আসিবে না !!

আজও ধর্ম্মবীর সন্ন্যাসীদের দিকে তাকাইয়া খেদের সহিত বলিলেন,—"আল্লাহ্! হে দীন-দুনিয়ার মালিক! এই সব বাহা-ভট্‌কা আদম-সন্তানের মতি-গতি কি সত্য ধর্ম্মের দিকে ফিরিবে না ?" ইহা বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন মুফ্‌তী সাহেব আর সেই পাঠান সর্দ্দার। আর সেই তেজস্বী যুবক মোস্তফা খান বোখারী ? বোখারী বসিলেন না—কৌতুহলবশে নদীর ধারে ধারে নদীর শোভা, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, ছোট বড় নৌকা-ডিঙ্গী দেখিতে দেখিতে, মাঝী-মাল্লার গান শুনিতে শুনিতে ত্রিবেণীর বন্দরের দিকে গমন করিলেন। স্বভাবের অপরূপ শোভা, হাট-বাজারের বেচা-কেনা, জনতার কোলাহল দেখিতে শুনিতে এই যুবকের খুব অভ্যাস। যেখানে লোকের ভিড়, সেখানেই মোস্তফা হাজির ; যেখানে কেহ বিপন্ন, পরদুঃখকাতর মোস্তফা সেখানে গিয়া শরীর দিয়া হউক, পয়সা দিয়া হউক, তাহার উদ্ধারের চেষ্টায় মহাব্যস্ত। এইরূপ কার্য্যেই মহাপ্রাণ মোস্তফার ভারী আমোদ—রোজ রোজ এইরূপ করিয়াই তিনি ফেরেন।

গাজী সাহেব, মুফ্‌তী সাহেব আর সর্দ্দার সাহেবের সঙ্গে

ঘাসের উপরে বসিয়া কথা কহিতেছেন আর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতেছেন। তখন সময়টা বড় মনোরম! একে অপরাহ্ন, তাহাতে শরৎকাল, আকাশে মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই—যত দূর তাকাও, কেবল নীল—সুনীল চাঁদোয়া অতি সুন্দর শোভায় খোদা-তা'লার মহিমা প্রকাশ করিয়া দিগদিগন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নীচেও বড় বাহার! গাছ-পালা সবুজ পাতার সবুজ রঙের ছটায় মাধুরী-ভরা হইয়াছে।

কথা কহিতে সকলের নয়ন মুদিয়া আসিল! কি শান্ত—ধীর মূর্ত্তি! যেন পাথরে গড়া ছবি!! কেবল তসবীহ্ জপ করার জন্য অঙ্গুলি নড়িতেছে, নহিলে কে বলে তাঁহারা জীবন্ত মানুষ? আর নড়িতেছে তাঁহাদের সুন্দর দলমলায়মান দাড়ী-গুচ্ছ আর মাথার পিছনে পাগড়ীর খুঁট। সেটা বাতাসের কাজ। বাতাস ফুর্ ফুর্ করিয়া দাড়ী আর খুঁট দুলাইয়া চলিয়া যাইতেছে।

গাজী সাহেব ভাবিতেছেন,—"শর্ম্মা ঠাকুর আসিতেছেন না কেন? তবে কি তাঁর ছেলেটীর বেমার সারে নাই? আহা, আরাম হোক, আল্লাহ্ তারে জান-সালামতে রাখুন। ছেলেটী খুব ভাল—বাবার মত আকেলমন্দ। ইহারা ইস্লাম কবুল করায় আমাদের বহুত ফায়দা হ'য়েছে।"

হঠাৎ এই চিন্তার গতি অন্য দিকে ফিরিল—পাণ্ডুয়ার কথা মনে পড়িল। পাণ্ডু রাজার অত্যাচার, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ, জেঁওত কুণ্ড, যুদ্ধ ফতে—প্রভৃতি ঘটনা একে একে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে একবার বিষণ্ণ, একবার আনন্দিত

করিতে লাগিল। অবশেষে ভাবিতে লাগিলেন,—বহু কষ্টে পাণ্ডুয়া ফতে হ'য়েছে, বহু মুসলমান এখানে শহীদ হ'য়েছে। আহা, সৈয়দ হোসামুদ্দীন নাগোরী, কাজী মাওজ্জম, আর গোল-বেহেশ্‌ত্‌ মনুয়ারের * কথা মনে হ'লে অন্তর যেমন হেম্মতে নেচে ওঠে, তেমনি আবার দুঃখে নুয়ে পড়ে। উঃ, দুরন্ত কাফেরের হাতে এদের কি কষ্টেই না মউত হ'য়েছে! আমরাও কি কম যন্ত্রণা পেয়েছি! কিন্তু এখন আমাদের আনন্দের সীমা নাই; এখন পাণ্ডুয়ায় ইস্‌লামের নিশান উড়েছে, আমার মামুজি দরবেশ শাহ্‌ সফিউদ্দীন সাহেবের ফেকেরে, আল্লার কৃপায় ঘরে ঘরে ইস্‌লাম জারি হ'য়েছে। প্রাণ না দিলে কি ইস্‌লাম জারি হয়? দেহ পাত না ক'রলে কি নিজেকে খাঁটি ইস্‌লামে দাখিল কবা যায়? ইস্‌লামই খোদা-তা'লার মনোনীত ধর্ম্ম—ইস্‌লামই এক নিরাকার আল্লার বন্দেগী ক'রতে শিক্ষা দেয়, একথা কি কাফেরদের মন সহজে বুঝিতে চায়? আমরা তো তুচ্ছ কীট, আমরা ইস্‌লামের ইজ্জৎ বজায় জন্য কি ক'রেছি? পাণ্ডুয়ার ধর্ম্মযুদ্ধে কি এমন বেদনা-ব্যথা পেয়েছি? যিনি আমাদের দীনের কাণ্ডারী—সঙ্কটে সহায়, সেই পয়গম্বর-রত্ন হজরত রসুলে করিম (দঃ) জগতের মঙ্গল ক'রবার জন্য যে যন্ত্রণা পেয়েছিলেন, তাহার তুলনা কোথায়? সে হিসাবে আমাদের এ দুঃখ—এ ব্যথা কিছুই নয়। হায় হায়, বলিতে

* ইঁহারা পাণ্ডুয়ার ধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। মহানাদে কাজী সাহেবের এবং পাণ্ডুয়ার নামাজ-গাহের নিকট মনুয়ার সাহেবের মজার আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বুক ফেটে যায়, প্রাণ হু-হু ক'রে জ্বলে ওঠে! দুরন্ত কাফেরগণ কেবল অত্যাচার নয়,—সেই মহাপুরুষকে প্রাণে মারিতেও কম চেষ্টা করে নাই! হায়, তিনি শয়তানদের জবরদস্তী এড়াবার জন্যে কাতর প্রাণে সাধের জন্মভূমি ছেড়ে গিয়েছিলেন; তাঁর পবিত্র মুখের—পবিত্র দান্দান (দন্ত) শহীদ হয়েছিল—অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়েছিল—রক্তে ডুবে গিয়েছিল। তাঁর চাচা মহাবীর হজরত হামজা, আরো কত কত বীর অকাতরে ইস্‌লামের জন্যে লড়িয়া দেহপাত করেছিলেন! ওহ!"

এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাঁহার চক্ষের পানিতে বক্ষ ভাসিয়া গেল—প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন। আর ভাবিতে পারিলেন না। বহু ক্ষণ পরে আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আল্লাহু-তা'লা! এই দরিয়ার কেনারে মস্‌জিদ বানাইয়া তোমার এবাদৎ আর ইস্‌লামের মহিমা জাবি করিতে আমার বাসনা। দয়াময়! বান্দার আশা পূর্ণ কর।"

এই সময়ে কয়েকটী সন্ন্যাসী গাজী সাহেব ও তৎসঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ের সহিত বলা-কওয়া করিতে লাগিলেন—"আরে এরাও তো দেখ্‌চি গঙ্গামায়ীর ভক্ত, ঐ দেখ ওরা অকপটে মায়ের ভক্তিতে বিভোর!—সেই ভক্তির ধারা ওদের দু-নয়নে উছলে উঠেছে! আহা কি তন্ময়ত্ব! কি যোগ-সাধন!! তবে এরা মুসলমান, এদের সাধনাও ভিন্ন। হোক মুসলমান—হোক ভিন্ন, ক্ষতি কি? মায়ের পূজা যে যে-রূপেই করুক, তা মায়ের চরণেই গিয়ে পৌঁছবে!"

একথা এখানে এই পর্য্যন্ত থাকুক। পাঠক ওদিকে আর এক দৃশ্য দেখুন।

গঙ্গা আবেগময়ী—চঞ্চলা! স্রোত খরতর বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। ঢেউর উপর ঢেউ উঠিতেছে, পড়িতেছে, ছুটিতেছে। ছুটিতে ছুটিতে গিয়া বেলা-ভূমে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। আছাড় খাইয়াও স্থির নয়, আবার উঠিয়া ছুটিতেছে—লুটিতেছে—কেনারাব লতা-পাতা-ফুল ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কোন কোন অবগুণ্ঠনবতীর জলের কলসী তফাতে টানিয়া আনিয়া রসিকতা করিতেছে।

এই অবস্থায় গঙ্গা-বক্ষে—সাধন-ভূমির কিঞ্চিৎ দূরে একটী রমণী একাকিনী—যেন সোণার কমল জলের উপরে শোভা পাইতেছে! রমণী যুবতী—সুন্দরী! রমণীর মুখ খানি প্রভাতের পদ্মের ন্যায় ঢল্‌ঢলে,—কিন্তু বিষাদ-মাখা, কিসেব যেন একটা কঠোব চিন্তা তাহার বদনে অঙ্কিত রহিয়াছে। রমণীব মুখে ঘোমটা নাই, তাহাব কোমল কেশগুচ্ছ বেণীবদ্ধ বটে, কিন্তু তাহার পারিপাট্য সাধনে তত যত্ন নাই, বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহার বাহুযুগল সুগোল—কোমল, নয়ন টল্‌টলে—সুন্দর!—তাহার চাহনীটীও সুন্দর! সেই বাঁকা চোখের বিলোল চাহনী কত প্রাণ মুগ্ধ করে, কত জনকে আকুল উদাস করিয়া ফেলে।

রমণী গঙ্গা-জলে বক্ষ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দণ্ডায়মানা। যেন নীরবে কি ভাবিতেছে। তাহার কুসুম-কোমল তনু আলিঙ্গন করিয়া স্রোত উল্লাসে বহিয়া যাইতেছে। ঢেউ দমকে দমকে তালে তালে সেই নীরব দেহ দুলাইয়া দুলাইয়া খেলা করিতেছে;

রমণীর প্রাণে কি এক আরাম—কি সোয়াস্তি ঢালিয়া দিয়া যাইতেছে। রমণীর দৃষ্টি গঙ্গার উপর, সে দৃষ্টি হইতে কিসের যেন একটা আবেগ—কি যেন একটা চিন্তাপূর্ণ করুণ ভাব প্রতিভাত হইতেছে। যুবতী নীরবে কি ভাবিতেছে, কে জানে? এইবার তাহার মুখ ফুটিল, হাত দুটী যোড় করিয়া অধোমুখে চাহিয়া করুণকণ্ঠে বলিল,—"মা ব্রহ্মময়ি জগজ্জননী গঙ্গে! মা, তুমি ত্রিতাপ-নাশিনী মা! তুমি জগতের শোক-তাপ-জ্বালা-ব্যথা দূর কর মা। আমার কি মনের ব্যথা—হৃদয়ের জ্বালা দূর করিবে না মা? আমার প্রাণের পিপাসা কি মিটাইবে না মা? মা গো! তুমি ভক্ত-বৎসলা, ভক্তের মনোবাঞ্ছা তুমিই পূর্ণ করো শুনিতে পাই। এ কাঙ্গালিনীও যে তোমার ভক্ত মা? আমি ভক্তির সাথে তোমারই পূজা করি মা, তবে কেন আমার মনের বাসনা পূরাবে না মা? মা গো! এ অভাগিনীর মনের খবর তুমি সবই জান। দুর্গতি-নাশিনি! আমার বুকের ভিতর যে আগুন দিবানিশি ধিকি-ধিকি জ্বলচে, তোমার এই শীতল জলে ডুবেও তা তো ঠাণ্ডা হ'ল না মা!"

রমণী ক্ষণ কাল স্তব্ধ-ভাব ধারণ করিল। পরে দম ফেলিয়া আবার সজল নয়নে বলিল,—"হায়, আমার এ জীবন-যৌবন বৃথা! এ রূপে আর কি দরকার? কার জন্যে এ রূপ? যা নিয়ে রূপের গৌরব, সেই রূপময় দেবতাকে যদি হৃদয়ে না পেলাম, তবে এ রূপে কি দরকার? আহা প্রাণারাম! তুমি কোথায়? তোমার......" আর কথা বাহির হইল না,—হঠাৎ কোথা হইতে একটা সুর আসিয়া তাহার কাণে বাজিল, অমনি

মুখ বন্ধ করিল, চকিতা হরিণীর ন্যায় এদিক ওদিক চাহিয়া মাথা হেঁট করিয়া স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিল—

প্রেমের কিরূপ রূপ কে জানে!
তারে কেউ জানে না, কেউ চেনে না,
প্রাণ ছোটে তার গুপ্ত টানে।
তারি টানে সরোজ-বালা, প্রাণে ধরি দারুণ জ্বালা
সাজাইয়া হৃদয়-ডালা, চেয়ে থাকে ভানুর পানে।
চাতকিনী নানা ছাঁদে, বিনাইয়ে কতই কাঁদে,
সাগরের পানেও সে তো ফিরেও চাহে না—
ধারা-জল বিনে কিরে পায় সে আরাম তপ্ত প্রাণে
প্রেম-রসে যে জন রসে, থাকে না সে আপন বশে
অঙ্গ অবশ, বদন বিরস, আঁখি বরষে—
আকুল প্রাণে দিন্-রজনী মগ্ন থাকে বঁধুর ধ্যানে।

গান থামিল, কিন্তু যুবতীর কাণে—হৃ প্রাণে সে গান আর থামিল না; সে রাগিণী তবকে তবকে—পরতে পরতে তাহার অন্তর অধিকার করিল। তাহার পাণ্ডুবর্ণ বদন খানি নয়ন-জলে ভাসিয়া গেল। তখন যুবতী এক অব্যক্ত বেদনা-ভারে বলিল— "উঃ এ গান কে গাহিল? কোথা হইতে এ গান আসিল? আমার মনের ব্যথা—প্রাণের কথা এ গানে কে গাহিল? কিরূপে জানিল সে আমার মনেব ভাব! গানে আমারি কথাই ফুটে উঠেছে। আমিই তো হৃদয়-ডালা সাজিয়ে আমার দেবতারে সঁপিতে চাই! এ নব-যৌবন নৈবেদ্যরূপে তাঁর চরণে দিতে চাই!! কিন্তু দেবতার দর্শন পাই কৈ? যারে প্রাণের প্রাণ

থেকে ভালবেসেছি, তারে পাই কৈ ? অহো, তাঁরে কি পাব না ? অভাগীর আশা কি পূরবে না ? চাতকী জল জল ক'রে কি নিরধারা কাঁদবে ? নিষ্ঠুর মেঘ কি দয়া ক'রবে না ? যদি দয়া না হয়, তবে আর এ দগ্ধ প্রাণ রেখে কাজ কি ? মা দুঃখ-হারিণী গঙ্গে ! মা তোমার জলে এ দেহ বিসর্জ্জন দিয়ে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার শেষ ক'রব মা, আর হে ভগবান......"

"আর হে ভগবান" উচ্চারণের সঙ্গে পশ্চিম মুখে ফিরিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিতেই রমণীর মুখ বন্ধ হইয়া গেল। সহসা স্তম্ভিত ! মূর্ত্তি স্থির—ধীর—গম্ভীর। দেহের পরতে পরতে যেন একটা প্রবল বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল ! বুক ধ্বড়াস্ ধ্বড়াস্ করিয়া উঠিল। রমণীর আঁখি বিস্ময়-বিস্ফারিত—পলকহীন, ঘাটের উপরে চাহিয়াই নিমেষে কি চিন্তা করিয়া আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল— "এ কি ! এ কি ! এই না—এই না—এই না সেই ? এই সেই স্বপ্নের রূপরাশি ? এই না আমার হৃদয়-দেবতা—মনোচোর ! এই—এই—এই তো ! সই ! দেখ—দেখ—এই—"

আর কথা সরিল না, রমণী চেতনা হারাইল—পদদ্বয় স্রোতের বেগে দাঁড়াইতে অক্ষম হইল, অঙ্গ অবশ হইয়া জলের উপরে এলাইয়া পড়িল। রমণী ডুবিল। সেই কোমল কনক-তনু তরঙ্গের তাড়নায় হাবু-ডুবু খাইতে খাইতে স্রোতের বেগে ভাসিয়া চলিল ; তাহার শাঁখার বালা-শোভিত সুন্দর হাত দু-খানি যেন কিছু ধরিবার জন্য ডুবিয়াও দুই একবার জলের উপর উঁচু হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়, আর না—তরঙ্গের বেগে অভাগিনী দূরে পড়িয়া তলাইয়া গেল—হায়, সব ফুরাইল।

এই ঘটনার কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে শমশের শর্ম্মা পাণ্ডুয়া হইতে আসিয়া সাধন-ভূমিতে গাজী সাহেবের নিকটে উপস্থিত। তিনি চির-অভ্যাস বশতঃ আসিয়াই দ্রুত উচ্চকণ্ঠে সেই গঙ্গার স্তবটীর আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসীরা ভাবিলেন, ইহা গঙ্গাভক্ত গাজীর কণ্ঠ হইতেই উচ্চারিত হইতেছে! 'আহা কি মধুর স্তব!' এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসীরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

স্তব দ্রুত উচ্চারিত হইতেছে। তখনও সাঙ্গ হয় নাই, শেষ চারিটী চরণ—

"সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়ে পুণ্যবন্তম্,
স তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিম্ তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপীনম্ মাং,
তদিহ তব মহত্ত্বম্ তন্মহত্ত্বম্ মহত্ত্বম্।"

সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ জলের উপরে সুন্দরী রমণী-মূর্ত্তি ভাসমানা—ঐ যা ঐ অদৃশ্য! পরে এক খানি হস্ত—হস্ত সুন্দর শাঁখার বালায় শোভিত—জলের উপরে উঠিল—উঠিয়াই ডুবিল, আর একবার উঠিল, আবার ডুবিল! মূহূর্ত্তে উঠা-নামা শেষ হইয়া গেল।

সন্ন্যাসীদের অনেকের নয়নে এ দৃশ্য পড়িল! তাঁহারা অবাক্-নয়নে ইহা দেখিয়া ভক্তি-উচ্ছ্বসিত প্রাণে কোলাহল করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"ঐ তো—ঐ তো মা পতিত-পাবনী নারায়ণী—ঐ তো মা মকর-বাহিনী গঙ্গাদেবী! ঐ তাঁর নিবিড় কুন্তলরাশি—ঐ তাঁর শ্বেতোজ্জ্বল শঙ্খ-শোভিত হাত খানি! আহা, আজ কি দেখিলাম—শিবের আরাধ্যা ধন—

সর্ব্ব জীবের মুক্তিদায়িনীকে আজ দেখিলাম। মা—মা! ভক্তের প্রাণের ডাকে আজ তোমার আসন ট'লেছে মা—আজ তোমার আবির্ভাব হ'য়েছে মা! ধন্য তোমার ভক্ত গাজী দরাফ খাঁ। ধন্য তাঁর সাধনা। মায়েরে কি ক'রে ডাক্‌তে হয়, সে দরাফই জানে। দরাফ ব'লেছিলেন—শীগ্‌গীর মায়ের দেখা পা'বে। আজ তার সে কথা সত্য হ'ল মা—আমাদের জন্ম ধন্য হ'ল। দরাফের স্তবে মা তুষ্ট হ'য়ে দেখা দিলে, আমাদের সাধ মিটালে। যুগ-যুগান্তর ধ'রে যে পরম-পদ দর্শনের আশায় ছিলাম, তা সফল হ'ল মা। আইস রে শান্তির ভিখারী পাপী তাপী নর-নারী কে আছিস আয়, শুভ ক্ষণ চ'লে যায়, আয় আয় আয়, মায়ের পাদপদ্মে প'ড়ে জীবন সার্থক করি আয়, মোক্ষ লাভের সময় এমন আর হবে না।"

এই বাক্য পরিসমাপ্তির পরই উদ্‌ভ্রান্ত সন্ন্যাসীরা ঝুপ-ঝাপ করিয়া গঙ্গা-গর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িল; অমনি কোন্ অতল তলে ডুবিয়া স্রোতের বেগে কোথায় বিলীন হইয়া গেল, আর উঠিল না, জীয়ন্তে গঙ্গা-লাভ করিল।

কিন্তু অনেকে আবার মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান—অকারণে দেহ পাত করিল না। তাহারা বুঝিল,—যাঁর ডাকে মায়ের আবির্ভাব, তিনি তো মায়ের চেয়ে মহীয়ান। তাঁর মাহাত্ম্যের সীমা নাই, তাঁর সাধনার তুলনা নাই, তিনিই নররূপে নারায়ণ! আমরা তাঁহারি সাধন-পথে চলিব—তাঁহারি চরণে পড়িয়া—দীক্ষা লাভ করিয়া মানব-জন্ম সফল করিব।

এই সন্ন্যাসীর দল ইহা স্থির করিয়া গাজী সাহেবের সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইলেন, সকলের ভক্তি উথলিয়া উঠিল, বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া নতভাবে যুক্তকরে বলিলেন—

কে তুমি ত্রিবেণী-তীর্থে হে পুরুষবর !
যোগে মগ্ন যোগাসনে যেন যোগীশ্বর ।
জীবের জ্বালা জুড়াইতে, প্রাণে সুখ-শান্তি দিতে,
অবতীর্ণ মর্ত্ত্যে যেন শান্তির নির্ঝর !
কি তব ধর্ম্মের বল, কি মহিমা সমুজ্জ্বল,
কিবা তত্ত্বজ্ঞানে ভরা তোমার অন্তর !
আমরা মোহান্ধ সব, কৃপার ভিখারী তব,
জ্ঞান দিয়া উদ্ধার হে জ্ঞানের সাগর ।

এই স্তুতি-গাথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকলে ভক্তির আবেশে ভূতল লুণ্ঠিয়া পড়িল ।

গাজী সাহেব অবাক্, মুফ্‌তী সাহেব অবাক্, সর্দ্দার সাহেব অবাক্ ! শর্ম্মা ঠাকুরও বিস্ময়-সাগরে ভাসিলেন। কিসে কি হইল—কেন এমন হইল, কেন কতক সন্ন্যাসী জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, তাঁহারা তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তে কি একটা লোমহর্ষণ ব্যাপার তাঁহাদের সম্মুখে কেন ঘটিল, তাহার মূল খুঁজিয়া পাইলেন না। ফলে ইহা লীলাময় আল্লাহ্-তা'লার লীলা—তাঁহার রঙ্গালয়ের একটী অপূর্ব্ব অভিনয়, ভাবিয়া গাজী সাহেব দুই হাত তুলিয়া মোনাজাত করিলেন,—"খোদাওন্দ করিম ! তোমার অপার মহিমা, তোমারি দয়ায় আমার আশা পূর্ণ হইল। এ খাকৃসার বান্দা এখানে তোমার এবাদৎখানা বানাইয়া তোমার বন্দেগী—তোমার ইস্‌লাম জাবি

করিতে যে ইচ্ছা করিয়াছিল, আজ তোমারি কৃপায় তাহার সূত্রপাত হইল।”

অপব সকলে ‘আমিন—আমিন’ বলিয়া মোনাজাত সাঙ্গ করিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব ছিল না—নামাজের সময় প্রায় উপস্থিত। তদ্দর্শনে গাজী সাহেব সেই ভূলুণ্ঠিত সন্ন্যাসী-গণকে উঠিতে বলিলেন,—সকলে যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইল। গাজী সাহেবের ইঙ্গিতে শর্ম্মা ঠাকুর সন্ন্যাসীদিগকে কহিলেন,—“কি আপনাদের অভিপ্রায়?”

সন্ন্যাসীরা সমস্বরে বলিলেন,—“আমরা চাই ঐ মহাপুরুষের দয়া—উহাঁর উপদেশ আর উহাঁর সঙ্গ।” “উত্তম—আমাদের সঙ্গে এস” বলিয়া শর্ম্মা ঠাকুর গাজী সাহেবের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে দ্রুতবেগে তাম্বুর দিকে অগ্রসর হইলেন। পশ্চাতে মুফ্‌তী ও সর্দ্দার সাহেব আর সেই সন্ন্যাসীরা চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মোস্তফার মহত্ত্ব

পাঠক, জানেন, মোস্তফা খান গঙ্গার ধারে ধারে ত্রিবেণীর বন্দরের দিকে যাইতেছিলেন। হঠাৎ এক স্থানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পশ্চাতে ফিরিতেই দেখিলেন—দূরে গঙ্গার ধারে কতকগুলি লোকের সমাবেশ, তাহাদের মাথার উপর দিয়া পুঞ্জে পুঞ্জে ধূমরাশি উঠিয়া দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্য মোস্তফার আগ্রহ জন্মিল। তাঁহার আর বন্দরের দিকে যাওয়া হইল না, গঙ্গার লহরী-লীলা দেখিতে দেখিতে সেই দিকে চলিতে লাগিলেন।

মোস্তফা নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, গঙ্গার চরে বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। বালীর উপরে এখানে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া বিছানা, সেখানে কয়লা, পোড়া কাষ্ঠ, মরার মাথা, ওদিকে ভাঙ্গা খাট, ভাঙ্গা চুড়ি, হাতের শাঁখা-ভাঙ্গা, আর মরার মাথা-প্রতিম নারিকেলে হুক্কা, কলিকা, কলসী, সরা প্রভৃতি বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। অদূরে কয়েকটী মোটা-সোটা কুকুর গঙ্গার সিক্ত সৈকতে শুইয়া তীব্র দৃষ্টিতে জনতার দিকে লক্ষ্য করিতেছে। কি ভীষণ ভাব! কি ভয়ঙ্কর বিষাদ-মাখা শুষ্ক প্রকৃতি শ্মশানের! স্থানটী যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে।

এই স্থানে কত সোণার চাঁদ কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, কত কোমলাঙ্গী রূপসী এক জনের বুকে ছুরি হানিয়া, কত নবীন

যুবক প্রাণের প্রতিমাকে দুর্দ্দশা-সাগরে ভাসাইয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। এই ভীষণ ভূমিতে কাহারও জারি-জুরি খাটে না! তুমি ইতর, আমি ভদ্র, তুমি শূদ্র, আমি ব্রাহ্মণ. তুমি পাপী, আমি সাধু, তুমি দরিদ্র, আমি ধনবান, তুমি মূর্খ, আমি পণ্ডিত—একথা এখানে চলে না। এখানে তোমার জাত্যভিমান, রূপবতীর রূপ-গর্ব্ব, ধনীর ধন-গৌরব সমস্তই চূর্ণ হয়! সব একাকার এখানে! এক দিন ছোট বড় সকলকেই এই মাটীতে লুটাইতেই হইবে—মিশিয়া যাইতে হইবে। সাম্য ভাবের পূর্ণ রাজত্ব এই খানেই।

মোস্তফা ক্ষণেক দাঁড়াইয়া শ্মশানের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বিকট দুর্গন্ধে তাঁহার নাসিকা পূর্ণ হইতেছিল। লোকেরা "হরিবোল হরি হরি" বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিতেই তিনি নাকে রুমাল দিয়া তাহাদের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, এক রাশি কাষ্ঠ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, আর সেই জ্বলন্ত আগুনের ভিতর একটা পুরুষের মৃত দেহ পুড়িতেছে, ফট্ ফট্ করিয়া দেহ ফাটিয়া মজ্জা বাহির হইতেছে। কি বিষম কাণ্ড! খানিক তফাতে আর এক রাশি কাষ্ঠের ভিতর একটী যুবতীর লাস। তাহাতে আগুন জ্বালিয়া দিতেই তাহার চিক্কণ কেশগুচ্ছ সর্ব্বাগ্রে ফুর্ ফুর্ করিয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল।

মোস্তফা এই কুদৃশ্য আর দেখিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। কিন্তু যাহারা পোড়াইতেছে, তাহাদের কি কঠিণ প্রাণ! তাহারা 'হরি-বোল-হরি' বলিতেছে, আর মোর্দ্দারের উপর কাষ্ঠ চাপাইতেছে—বাঁশের আঘাত

করিতেছে। উঃ কি নিষ্ঠুর—কি নির্ম্মমতার কার্য্য! মোস্তফা হিন্দুর এ প্রথাকে ধিক্কার দিতে দিতে চড়ার বালিরাশি ভাঙ্গিয়া দ্রুতপদে গঙ্গার পাহাড়ের উপরে উঠিলেন।

মোস্তফা শব-দাহের কথা ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন, তাঁহার মন সেই দিকেই রহিয়াছে। হঠাৎ পানির ধারে দুই তিনটী স্ত্রীলোক কল্-বল্ করিয়া উঠিল; তন্মধ্যে একটী প্রৌঢ়বয়স্কা রমণী আকুল-কণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল,—"ওগো—ওগো কি হ'ল গো,—ওগো তোমরা দৌড়ে এসে ধর গো, ঐ বুঝি তলিয়ে গেল গো—ঐ ধরো—ধরো গো! ঐ আবার ভেসে উঠেছে গো! শীগ্‌গীর ধরো।"

রমণীর চীৎকার-ধ্বনি মোস্তফার কাণে পৌঁছিল। তিনি জলের দিকে তাকাইলেন। দেখিলেন, একটী মানুষ ভাসিয়া যাইতেছে, তরঙ্গের তোড়ে ডুবিতেছে, উঠিতেছে। মোস্তফা বিস্ময়ের সহিত ঘাটের ধারে-ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন। এই তো এই ঘাটে পানিতে কে একটী আওরত দাঁড়াইয়াছিল! এই তো আমি তাহাকে দেখিয়া যাইতেছি! সে তো বেশী ক্ষণ নয়! তবে সেই আওরতই ডুবেছে। সেই—সেই, নিশ্চয়ই সেই!"—

মোস্তফা মনে মনে এইরূপ তোলা-পাড়া করিতেছেন, ইতিমধ্যে শবদাহকারীরা দুই তিন জন ছুটিয়া আসিল, দুই একটী করিয়া পুরুষ-নারী অনেক লোক পাহাড়ের উপরে—নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে বহু লোক জমিল, রমণী জলে হাবু-ডুবু খাইতেছে, দেখিল। কিন্তু কেহ

তাহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টিত হইল না। এক জন বলিল,—"কে এখন ওবে ধত্তে যাবে? একে সোঁতের খর টান, তাতে আবাব ঢেউব ওপর ঢেউ! না বাবা কাজ নেই, শেষে কি নিজের প্রাণটা খোওয়াব?"

কিন্তু মোস্তফা—সেই পরোপকাবী তেজস্বী যুবক, পরেব দুঃখ দেখিলে যাঁহার হৃদয় আকুলিয়া উঠে, লোকের ভাব-গতিক দেখিয়া বিষম বিরক্ত হইলেন। রমণী দরিয়ার পানিতে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইতেছে, দেখিয়াই তাঁহার অন্তরে সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই মোস্তফা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কোমবে কোর্ত্তার উপরে দৃঢ়রূপে রুমালখানি বাঁধিয়া বেগভরে ছুটিলেন—গঙ্গার বালিরাশির উপর দিয়া দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া গিয়া 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' বলিয়া স্রোতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

অসীম সাহসিক যুবক! প্রাণের মমতা কবিলেন না, বিপদেব কথা ভাবিলেন না, তবঙ্গের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন, আর ভীরুর দল ডেঙ্গায় দাঁড়াইয়া মোস্তফার দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ক্রমে ঘাটেব কূলে ভিড় বাড়িল—বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নবীন-নবীনা, বালক-বালিকা জলের ধারে-ধারে—গঙ্গাব পাহাড়ে-পাহাড়ে কাতার দিয়া খাড়া হইল। আবাব অনেকে স্রোতের দিকে নদীর উঁচু-নীচু ভাঙ্গন ডিঙ্গাইয়া আঘাটাব পানে ছুটিল। কত আহা-উহু, কত হা-হুতাশ চলিতে লাগিল।—আহা কার বাছারে, আহা কি ক'রে ডুব্‌ল? ভগবান রক্ষা ক'রো, ঘাটে আর কি কেউ ছিল না গা?—ইত্যাকার কত কথা কত মুখে বাহিব হইল। কাহার কাহার

চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল,—"মেয়েটী কাদের?" 'কে জানে কাদের মেয়ে' এই ফাঁকা উত্তর অন্য-মনস্ক-ভাবে অপরে করিল।

কিন্তু মেয়েটী যে কে এবং কাহাদের, পাঠকের তাহা জানিতে বাকী নাই। তথাপি এস্থলে একটু কৈফিয়ৎ কাটা আবশ্যক। মিশ্র-দুহিতা লীলাবতী তাহার সই বামাসুন্দরীর সঙ্গে গঙ্গায় গা ধুইতে আসিয়াছিল। বামাকে প্রত্যহ বৈকালে দুই কলসী গঙ্গা-জল লইয়া যাইতে হইত। বামা ভাবিয়াছিল, সইয়ের গা-ধোয়া সাঙ্গ হইতে না হইতে সে এক কলসী জল ঘরে রাখিয়া আর একটী কলসী লইয়া ঘাটে আসিতে পারিবে, শেষে দুই সই এক সাথে বাড়ী আসিবে। এই স্থির করিয়া বামা লীলাবতীকে ঘাটে রাখিয়া জল লইয়া গৃহে গিয়াছিল। সে যখন অন্য একটী কলসী-কক্ষে ফিরিতেছিল, কিয়দ্দূর আসিয়াই শুনিল,—ঘাটে কে ডুবিয়া গিয়াছে।—কে ডুবিয়াছে? আমি যে ঘাটে সইকে রেখে গিইছিলাম? বামা চমকিয়া উঠিল—মনে শঙ্কা জন্মিল, দ্রুত পা তুলিয়া দিল। তফাত হইতে নজর করিয়া দেখিল—ঘাটে সই নাই।—তবে তো সই-ই ডুবেছে? বামার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। "যাঃ সর্ব্বনাশ হয়েছে! যা ভেবেছি, তাই! ও মা, কোথায় যাব, সই আমার কোথায় গেল গো! আমি যে তারে এই রেখে গেছি গো! ও মা, কি হবে গো! ঠাকুর-ঠাকুরুণ শুনলে কি আর বাঁচবে? হায় হায়! কি হবে—কি ক'রব।" এইরূপ বলিতে বলিতে বামা কক্ষের কলসী দূরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া জলের ধারে পড়িয়া

অবশাঙ্গে কাঁদিতে লাগিল। তাহার চক্ষের জলে বুক ভাসিতে লাগিল! তাহার মর্ম্ম ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন জন কয়েক স্ত্রীলোক ও পুরুষ তাহার কাছে গিয়া বুঝিল, ডুবেছে মিশ্র ঠাকুরের মেয়ে। মিশ্র ঠাকুরের মেয়ে? কি সর্ব্বনাশ! সেই মেয়েই যে ঠাকুর-ঠাকুরাণীর সংসারের সম্বল! আহা মেয়েটী ভরা সোমত্ত। তাঁরা কি এ খবর জান্‌তে পেরেছেন?" বামা কাঁদুনী সুরে বলিল,—"না গো—না, কেমন ক'রে জান্‌বে তারা, মাগো-মা! নিমেষের ভেতর কি হ'ল গো মা!" ইহা শুনিয়া নীলে পাটনীর দিদি 'আমি গিয়ে খবর দিচ্চি' বলিয়া দৌড়িল।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী উঠিতে-পড়িতে দুই তিনটী প্রতিবেশিনীর সঙ্গে ঘাটে ছুটিয়া আসিলেন। "বামা! কি করলি রে বামা! কেন আমার মারে একলা ঘাটে রেখে গেছিলি বামা" বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন —বৃদ্ধা হুঁশ হারাইলেন। তখন তাড়াতাড়ি বামা 'ও-মা! আবার কি হ'ল গো' বলিয়া বৃদ্ধাকে ধরিয়া বসাইল. অন্য একটী স্ত্রীলোক জল আনিয়া মুখে দিল, ব্রাহ্মণীর হুঁশ হইল। তিনি বলিলেন,—"কৈ আমার মা কৈ? ওগো! আমার নীলি—আমার মা কোথায় ডুবেছে বল। মা গঙ্গা! তবে আমারেও ন্যাও" বলিয়া পাগলিনীর ন্যায় উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন। "ও-মা! করেন কি—করেন কি!" এই কথা বলিতে বলিতে বামা ও অপর স্ত্রীলোকেরা ব্রাহ্মণীকে চাপিয়া ধরিল। এই সময়ে অনেকে বলিল,—"ভয় নেই—ভয় নেই. আপনার মেয়ে বেঁচেছে, ঐ তারে নিয়ে আস্‌ছে।"

"ওগো কোথায় ? ওগো কোন্ দিকে আমারে দেখাও।" এই কথায় বামা ও অন্য রমণীর দল ব্রাহ্মণীকে ধরিয়া জলের ধারে ধারে লইয়া যাইতে লাগিল। মিশ্র ঠাকুরও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখে কথা নাই, অশ্রুপাত করিতে করিতে দুই-এক পা চলিতেছেন।

সকলেরই চক্ষু গঙ্গার উপরে মোস্তফার দিকে। বলিষ্ঠ মোস্তফা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াই বেগে সাঁতার কাটিতে লাগিলেন, সত্বর নিকটে উপস্থিত হইয়া নিমজ্জিতা বালিকাকে ধরিয়া ফেলিলেন—কৌশলে পৃষ্ঠে লইয়া আবার সাঁতার কাটিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয়, সে সময় নদী-বক্ষে নৌকা-ডিঙ্গী ছিল না। দূরে অন্য পারে কয়েক খানা ডিঙ্গী বাঁধিয়া জেলেরা জাল কাচিতেছিল বটে, কিন্তু লোকের ডাকা-ডাকি হাঁকা-হাঁকি তাহাদের কাণে পৌঁছিল না।

মোস্তফা বিলক্ষণ সন্তরণ-পটু, তাঁহার সন্তরণ-কৌশল প্রশংসনীয়। তিনি বালিকাকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া সাঁতার কাটিতেছেন—তীর-লক্ষ্যে স্রোতের দিকে চলিতেছেন। এক একটা ঢেউ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার দেহের উপর দিয়া বালিকাকে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যাইতেছে, মোস্তফার নাকে-মুখে-চোখে পানি ঢুকিতেছে, যুবক ফোঁশ-ফোঁশ করিয়া নিশ্বাস টানিতেছেন আর দুইটী বলিষ্ঠ বাহু দিয়া তরঙ্গ ঠেলিয়া ফেলিতেছেন। এইরূপে কিছু ক্ষণ জলযুদ্ধ করিয়া যুবক কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার হাত তুলিতে কষ্ট হইতে লাগিল। হাত ভারাক্রান্ত—কূলের দিকে তাকাইলেন ; কিন্তু তখনও কেহ তাঁহার সাহায্যার্থ আসিল না

দেখিয়া বীর-যুবা মনে মনে বিবেচনা করিয়া এক হস্তে যুবতীকে ধরিয়া ধাঁ করিয়া চিৎ হইলেন—চিৎ হইয়াই তাহাকে বুকের উপর লইয়া চিৎ-সাঁতার কাটিতে লাগিলেন! নির্ভীক ধর্ম্মভীরু যুবক নিরুদ্বেগে সাঁতার কাটিতে লাগিলেন। চিৎ-সাঁতারে তাঁহার শ্রমের অনেক লাঘব হইল। এই সময়ে লীলাবতীর জ্ঞান হইয়াছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিল; কিন্তু তখনি আবার চোখ বুঁজিয়া নীরব—স্থির হইয়া রহিল।

মোস্তফা বুকে বোঝা লইয়া ক্রমে ক্রমে নদীর কেনারার দিকে ঘনাইয়া আসিলেন। এই সময়ে ডেঙ্গা-হাম্‌রাইয়ের দল "তুই এক জন জলে নাব—জলে নাব, ধ'রে নিতে হবে—বামা তুই নাব্—মেধো দাঁড়িয়ে আছিস্ যে, নাব্ না রে?"—এই প্রকার শোর-গোল তুলিল; কিন্তু নিজেরা কেহ নামিল না—হুকুম করিয়াই খালাস! এই গোলমালে দু-দশ জন জলের ধারে গেল। কিন্তু পাড়ার বৃদ্ধ বাদল দাস ঘাটের কেনারায় জলে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"থামো—থামো;—এ কাজ যারে তারে দিয়ে হবে না। হ্যাদে ও পট্‌লীর মা, তুমি নাপিত-বৌ, আর ঐ বামা, তোমরা জলে নাবো তো?"

"আমরা কি সাম্‌লাতে পারব?" নাপিত-বৌ এই আপত্তি তুলিলে বাদল বলিল,—"আরে কেবল তোমরাই কি যাবে? আমি এই নেবেচি, আর ঐ সুরেণ ঠাকুরও আস্‌চেন—ঠাকুর এস তো? মেয়ে মানুষের ব্যাপার ব'লেই তোমাদের ডাক্‌চি?"

বাদলের কথায় সুরেণ ঠাকুরও জলে নামিল। সঙ্গে সঙ্গে পট্‌লীর মা, নাপিত বৌ, বামা এবং আরো তিন চারিটী রমণী

এক বুক জলে গিয়া দাঁড়াইল। মোস্তফা নিকটবর্ত্তী হইতেই বাদল ও সুরেশ ঠাকুর হাত বাড়াইয়া দিয়া লীলাবতীকে টানিয়া লইল। বামা আর নাপিত-বৌ তাড়াতাড়ি লীলাকে ধরিয়া তাহার কাপড় ঠিক করিয়া দিল এবং ধরাধরি করিয়া ডেঙ্গায় আনিল। তখন নানা মুখে উদ্ধার-কর্ত্তার ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠিল। মিশ্র-পত্নী কন্যাকে বুকের ভিতর দুই হাত দিয়া ধরিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন, মিশ্র ঠাকুরও দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দুঃখের ভিতর সুখেব উদয় দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ ফুল্ল হইল। অগৌণে দুই এক জন বিজ্ঞ লোক লীলার পেটেব জল বাহির কবিবার ব্যবস্থা কবিয়া দিল।

মোস্তফা খান তাঁহার বুকের বোঝা নামাইতেই খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন—হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বহু ক্ষণ সন্তরণে তাঁহার অতিশয় ক্লান্তি হইয়াছিল, হাত-পা অবশ—অসাড় হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যের সফলতার জন্য তাঁহার অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিল। "আল্লাহ্-তা'লা! তোমাবি দযাতে আজ এ আওরত প্রাণে বাঁচিল" বলিয়া ধীরে ধীরে পানি হইতে উপরে উঠিলেন। তখন অনেক লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; কত ধন্যবাদ, কত প্রশংসা মোস্তফার ভাগ্যে ঘটিল।

মোস্তফার পোষাক হইতে ঝর ঝর করিয়া পানি ঝরিতে-ছিল। তিনি মাথায় হাত দিয়া বুঝিলেন যে মাথায় টুপি নাই।—"ওঃ টুপি? তবে দরিয়ায় ভেসে গিয়েছে—যাক্ সে টুপি, আজ হাজাব টুপি গেলেও হানি ছিল না। এক টুপির বদলে আজ

আল্লার একটা বান্দার জান রক্ষা হ'য়েছে। টুপি গিয়েছে, টুপি মিলবে, কিন্তু মানুষ গেলে মেলে না।" হাস্যমুখে ইহা বলিয়া কোমরের রুমালখানি খুলিয়া মোস্তফা মাথা-মুখ মুছিলেন, আর কোর্ত্তাটী খুলিয়া নিংড়াইয়া কাঁধে ফেলিলেন।

লোকে মোস্তফার সৎসাহস, সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ পরোপকার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। এখন তাঁহার নগ্ন দেহ—সুন্দর গঠন-সৌষ্ঠব দেখিয়া অবাক্ নয়নে চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ বলিল,—"দেখেছ্ শরীরের বাঁধন! কি বলিষ্ঠ! যেমন রূপ, তেমনি গুণ!!" আর এক জন বলিল,—"এ কি যেমন-তেমন লোকের কাজ? দেহখানা কি! দেখ্‌লে ভক্তি হয়; আর কেউ হ'লে কি এই তরঙ্গের তোড়ে পাঁউরে আস্‌তে পারত? কখনই না।"

সইকে যিনি উদ্ধার করিয়াছেন, বামার তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল। যিনি এমন পরমোপকারী—বিপদে বন্ধু, একবারটী তাঁহাকে এক নজর দেখিবার জন্য বামা ছল-ছুতায় উঠিয়া দাঁড়াইল, ভিড়ের ভিতর ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি চালাইয়া দিল; যাহা দেখিল, তাহাতে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল—তাহার বুকের ভিতর ঝড় বহিতে লাগিল। মনে মনে বলিল,—"একি! কোথাকার কি কোথায়? যার জন্যে সই পাগল,—এ তো সেই! একি বিধাতার খেলা! এ খেলার শেষ কি হবে, কে জানে! আমারো মনটা যে কেমন ক'রে উঠ্‌ল।" বামা এই চিন্তা মনে লইয়া বসিয়া পড়িল এবং লীলার কাণের কাছে চুপি চুপি কি বলিল।

ইত্যবসরে বাদল দাস মিশ্র ঠাকুরকে বলিল,—"দাদা ঠাকুর,

মেয়েটারে ভিজে কাপড়ে এখানে রাখা ঠিক নয়; বেলাও শেষ হ'য়েছে, চলুন বাড়ী নিয়ে যাই।"

মিশ্র ঠাকুর সম্মতি দিলেন। তখন বামা সইকে ধরিয়া তুলিল। লীলাবতী দাঁড়াইল, একবার আড়-নয়নে ঘাটের দিকে চাহিল। বামাও চাহিয়াছিল কি না, জানি না। শত লাঞ্ছনার মধ্যেও লীলাবতীর অন্তর আহ্লাদে ভরিয়া গিয়াছিল— ধীরে ধীরে বামার স্কন্ধে ভর দিয়া নতমুখে চলিল। সঙ্গে পটলীর মা, নাপিত বৌ, পাটলী দিদি, কামিনী ঘোষাণী, কাদী, পদী, সদী চলিল।

বৃদ্ধা মিশ্র-পত্নী স্বামীর দিকে চাহিয়া "ছেলেটী একবার কি আমাদের বাড়ী যাবেন না? নিয়ে এস।" বলিয়া মেয়ের পাশে পাশে চলিলেন।

মিশ্র ঠাকুর গোলমালের ভিতর এ পর্য্যন্ত মোস্তফার সহিত একটী কথা কহিতেও অবসর পান নাই। তাঁহার অন্তর কৃতজ্ঞতায় ডুবিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তিনি বীর যুবকের সম্মুখে গিয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—"বাবা! তোমার এ উপকার জীবনে ভুল্‌তে পারব না। আমার কন্যা আজ তোমা হ'তেই জীবন-দান পেয়েছে। ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন। তা বাবা! একবারটী তোমাকে আমাদের বাড়ী যেতে হবে বাবা!"

"আমাকে আর আপনাদের কি দরকার? আমার এখনি তাম্বুতে যেতে হবে" বলিয়া মোস্তফা অনিচ্ছা জানাইলেন।

মিশ্র ঠাকুর বলিলেন,—"না বাবা, একবার তোমার এ কাঙ্গালের কুঁড়েতে যেতেই হবে।"

মোস্তফা বলিলেন,—“এ বদ্‌হালে ভিজে কাপড়ে যাওয়াই মুশ্‌কিল। আরও মুশ্‌কিল, নামাজের সময় উপস্থিত ব’লে—আমাকে এখনি তাম্বুতে গিয়ে এই ভিজা কাপড় বদ্‌লে ফেলে নামাজ প’ড়্‌তে হবে।”

“ঠাকুর কাকুতি-মিনতি ক’রচেন—কাপড়ের অভাব হবে না; একবার পায়ের ধূলো দিলে ভাল হয়।” বাদলের এই কথায় মোস্তফা বলিলেন,—“নামাজের সময় অন্য কাজ হ’তে পারে না—আচ্ছা, উনি জেদ ক’রচেন, আমি ফোরসৎ-মত দেখা ক’রব।”

বাদল বলিল,—“তবে তাই—তাই—সেই ভাল; এই পথে মিশ্রী ঠাকুরের বাড়ী—বাড়ী খুব তফাত নয়।” মোস্তফা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। মিশ্র ঠাকুর, বাদল দাস এবং আর আর অনেক লোকের সঙ্গে মোস্তফার গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে বাড়ীর দিকে চলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

আশার পূর্ণ সফলতা

ত্রিবেণী নগরীতে বড় হুল-স্থুল বাধিয়া গিয়াছে। আজ জাফর খান গাজী ত্রিবেণীর নর-নারীর মুখে মুখে ফিরিতেছেন। উচ্চারণ-দোষে কেহ তাঁহার নাম জাফর, কেহ দফর, কেহ দরাপ করিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিকে রব উঠিয়াছে,—গঙ্গার কূলে এক জন মুসলমান সাধু এসেছেন, তিনি খুব ধার্ম্মিক—সিদ্ধ পুরুষ। তাঁর নাম দরাফ খান। দরাফ গঙ্গা দেবীর পরম ভক্ত। তাঁর ভক্তিতে—তাঁর সাধনায় মায়ের আসন টলে—মা উজান চলেন। এই যে কত কাল ধ'রে সন্ন্যাসীরা পতিত-পাবনী মা জাহ্নবীর দর্শনের জন্যে তপ-জপ কচ্ছিলেন, তাঁদের তপ-জপের আর কি ফল হ'ল! সবই ভূয়ো। কাল সাধক দরাফের ডাকে—দরাফের ভক্তি-ভরা স্তব-স্তুতিতে ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গা সিংহাসন সহিত জলের উপরে ভেসে উঠেছিলেন—গঙ্গাভক্ত সন্ন্যাসীদের দর্শন-সাধ মিটিয়েছেন! সন্ন্যাসীরা মায়ের হাতে শাঁখার বালা—মোহিনী মূর্ত্তি দেখেই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহ ত্যাগ ক'রেছেন—সশরীরে স্বর্গে গিয়েছেন।

এই জনরব পাড়ায়-পাড়ায়, হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, ঘরে-বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ছেলে-বুড়, পুরুষ-স্ত্রী সকলেরই

* ইস্‌লামী শব্দের উচ্চারণ না জানা থাকায় সাধারণ লোকে জাফর শব্দকে দাফর, বা দফর করিয়া ফেলিয়াছে। লোকে 'দফরা গাজীর কুড়ুল' এখনও বলে। এই "দফর" শব্দ শেষে "দরাফে" পরিণত হইয়াছে।

মুখে এই কথারই আন্দোলন। আজ কাহার সংসার-ধর্ম্ম মনে নাই! দোকানী বেচা-কেনা ফেলিয়া, মেছুনী মাছ-বেচা বন্ধ রাখিয়া, পসারী পথের মাঝে পসরা নামাইয়া, কুলবধূ গৃহ-কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া, জননী ছেলের আব্দারে—কান্না-কাটায় কাণ না দিয়া এই আজব—অপূর্ব্ব কথায় ভোর হইয়াছে। আজ জাফর খাঁর প্রশংসা, জাফর খাঁর মহিমা ও দয়া-ধর্ম্মের কথা শত শত মুখে কীর্ত্তিত হইতেছে। যিনি শুনিতেছেন, তিনিও অবাক্, যিনি শুনাইতেছেন, তাঁহারও বিস্ময়ের সীমা নাই। বহু লোক আবার সেই সাধক-শিরোমণিকে দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিবার ইচ্ছায় নানা কথার অবতারণা করিতে করিতে ছুটিয়াছে।

কেহ বলিতেছে,—"এমন আশ্চর্য্যি কেহ কখন দেখে নাই—শুনেও নাই! এই ত্রিবেণী তীর্থে যা কখ্‌খনো হয় নি, হবার নয়, তাই হ'ল। এত সাধু-সন্ন্যাসী থাক্‌তে এক জন মুসলমানের স্তবে গঙ্গামাতা দেখা দিলেন! ধন্যি এই মুসলমানের সাধনা! এমন গঙ্গাভক্ত আর হবে না।"

ইহা শুনিয়া অন্য এক জন গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল,—"ও কি বলছ? ও-কথা মুখের আগায় এনো না।—তিনি কি মুসলমান? তিনি যে স্বয়ং ভগবানের অবতার! নইলে ওখানে তো সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেক দিন ধ'রে ধন্না দিয়ে প'ড়ে ছিল, ধুনি জ্বালিয়ে, শাঁক-ঘণ্টা বাজিয়ে মায়ের আরাধনা করিতে কেউ কসুর করেনি, কিন্তু বল দেখি, মায়ের দর্শন কি তারা পেয়েছে? ভাই হে, সাধনার বল না থাক্‌লে কেবল ছাই মেখে প'ড়ে থাক্‌লে কিছু হয় না। মা ব্রহ্মময়ী কি যারে তারে দেখা দেন?"

ইহার প্রত্যুত্তরে আর এক জন বলিলেন,—"ঠিক—ঠিক—ঠিক! লোকটী ভগবানের অবতারই বটে! নইলে দয়া-ধর্ম্ম—এত ক্ষমতা কি হয়? তাঁর আসা পর্য্যন্ত ত্রিবেণীর কাঙ্গাল-গরীবের আর খাওয়া-পরার কষ্ট নেই; যে তাঁর কাছে গিয়ে দুঃখু জানায়, সেই পয়সা-কড়ি কাপড়-চোপড় পায়! তা ছাড়া যে সব রোগ শিবের অসাধ্যি—কবিরাজে দেখে শুনে এলে দিয়েচে, তা তিনি এক ফুঁতেই আরাম ক'রে দিচ্ছেন। সাপের বিষ আর ভূত-পেত্নী তাঁর নাম শুন্‌লে আর থাকে না। বাপরে, কি ক্ষ্যামতা! আমি তাঁর পায় শত শত দণ্ডপাত করি।"

ইহা শুনিয়া অন্য দুই এক ব্যক্তি দুই হাত যোড় করিয়া গাজী সাহেবের উদ্দেশে মস্তক নত করিল। তখন জনতার মধ্য হইতে একটী যুবক লাফ দিয়া আসিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল,—"এ ছাড়া আর তো কেউ কিছু জান না? তবে বলি শোন—ওঁর ক্ষ্যামতার কথা ব'ল্‌ব কি—আমার ঠাক-মা এক দিন ভোরে গঙ্গা-স্নান ক'রতে গিয়ে দেখেন, উনি মাথায় পাকৃড়ী দিয়ে জলের ওপরে হেঁটে আস্‌ছেন। ঠাক-মা এই না দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন—তাঁর গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। তার পর থেকে ঠাক-মা রোজ ঘাটে গিয়ে সেই দিকেই তাকিয়ে থাকৃতেন। হঠাৎ এক দিন দেখেন,—উনি কোত্থেকে তাড়া-তাড়ি ঘাটে এসেই ব'ল্‌লেন—বেটি, এক লোটা পানি দাও। অমনি একটী সুন্দরী মেয়ে—তাঁর চারখানা হাত—হাতে শাঁখার বালা—মা-গো! ব'ল্‌তেও গা শিউরে উঠ্‌ছে, জলের ভেতর থেকে এক হাত দিয়ে একটী জল-ভরা পাত্র দিলেন। পাত্রের

জলে তিনি হাত-মুখ ধুয়ে ধ্যানে ব'স্‌লেন। এ আর কেউ নয়, আমার ঠাক-মা আপন চক্ষে দেখেছেন। এটা গোপনের কথা, বলে ফেল্লাম—ঈশ্বর যেন আমার হানি না করেন।”

যুবকের এই কথা শুনিয়া লোকে অধিকতর বিস্মিত হইল। ফলে সত্য ঘটনার সহিত এইরূপ অনেক উদ্ভট-অবাস্তব ঘটনার সৃষ্টি হইয়া লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল।

এক জন নিষ্ঠাবান হিন্দু পরামর্শ করিলেন,—“যে স্তবে মা গঙ্গা দেখা দিয়াছেন, সেই স্তবটী শিখিতে হইবে। সাধকের হৃদয়ের স্তব, হয় তো সেই স্তবে মা জাহ্নবী আমাদের উপরেও সদয় হইতে পারেন। তিনি কি স্তবটী আমাদের শিখাইবেন না?”

“আরে তিনি কি তোমার আমার মত লোক হে, তাই শিখাবেন না? পাপীর মুক্তির পথ দেখাতেই তো তাঁর এখানে আবির্ভাব! চল যাই, নিশ্চয়ই শিখাবেন।”

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকে উৎসুক-চিত্তে দ্রুত সেই দিকে চলিল।

রমণী-মহলেও এই আন্দোলন নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল বর্ণনা করিয়া আমরা আর পুঁথি ভারী করিতে চাহি না। ফলে ধনার মা, কেষ্টার পিসী, সদী ময়রাণী, তামলী বৌ, বামুন ঠাকুরুণ ইত্যাদি যত নামজাদা নারী গঙ্গা-স্নান ও গঙ্গা-জল আনার ছল-ছুতায় পাড়ার বৌ-ঝি পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া গঙ্গার কূল গুল্‌জার করিতে ক্ষান্ত হইল না। অনেক কুলবালা মাসি-পিসী, শ্বাশুড়ী-ননদ প্রভৃতির সঙ্গে গিয়া ঘোমটার ভিতর

হইতে গঙ্গার ঘাটের এদিকে ওদিকে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া কৌতূহল নিবারণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ধর্ম্মাত্মা জাফর খান গাজী প্রত্যুষে সদলবলে আসিয়া সন্ন্যাসীদের সাধন-ভূমি দখল করিয়াছেন। তাঁহার নিজের তাম্বু এবং কতিপয় বিশিষ্ট সহচরের তাম্বু উঠাইয়া আনাইয়া এখানে স্থাপন করা হইয়াছে। তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই; সকলের মুখে যেন বিজলীর ফোয়ারা ঝলক মারিতেছে। খাওয়া-দাওয়া, দান-খয়রাতের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এই পরমশুভ সংবাদ পাণ্ডুয়া-বিজয়ী ধর্ম্মবীর শাহ্ সফিউদ্দীনের গোচর করিবার জন্য এক জন জবরদস্ত পাঠান সৈনিক অশ্বারোহণে ছুটিয়াছেন।

গাজী সাহেব তাম্বুর ভিতরে উপবিষ্ট, পার্শ্বে শর্ম্মা ঠাকুর ও আর আর সকলে বসিয়াছেন। সম্মুখে সেই সন্ন্যাসীর দল অপরাধীর ন্যায় নতমুখে অবস্থিত। আজ তাঁহাদের ইস্‌লাম-গ্রহণের শুভ দিন।

আজ আর সন্ন্যাসীদের সে মূর্ত্তি নাই। সে শীলাময়ী দেব-দেবী, সে শঙ্খ-ঘণ্টা-চিম্‌টা, সে রুদ্রাক্ষমালা, গাঁজার কলিকা, ঝোলা-ঝাপটা গাজী সাহেবের আজ্ঞায় অকূল দরিয়ায় ফেলিয়া দিয়াছেন। আহা কত সাধের, কত যত্নের জিনিস, যাহা পবিত্র-জ্ঞানে—সাধন-পথের সহায়-জ্ঞানে এত দিন ফুল্ল মুখে বহিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহা অতি তুচ্ছ—অতি হেয়—অপকর্ম্মের সহায় জ্ঞানে গভীর জলে বিসর্জ্জন!—আজ তাহা স্রোতের টানে কোথায় ভাসিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। কেহ সে দিকে একবার

ফিরিয়াও চাহেন নাই—মায়া-মমতা করেন নাই। আজ আর কাহার মস্তকে জটার বোঝা নাই—সে বোঝা ফেলিয়া দিয়াছেন। আজ সকল মস্তকই মুণ্ডিত, হস্ত-পদের লম্বা লম্বা নখ ও গোঁফ কর্ত্তিত হইয়াছে। আজ দরিয়ার খরস্রোতে শরীরের ময়লা-মাটী ধুইয়া মুছিয়া—কোমরের দড়া-দড়ি-কৌপীন ফেলিয়া দিয়া সন্ন্যাসীরা গাজী সাহেবের আদেশে সুন্দর তহ্‌বন পরিয়াছেন, মাথায় শুভ্র টুপি, গায়ে কোর্ত্তা, কেহ কেহ বা চাদর দিয়াছেন। এখন কে বলিতে পারে ইহাঁরা সেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর নাম-গন্ধও আর তাঁহাদের শরীরে নাই—সে মনও নাই। ইহা আল্লাহ্-তা'লার কুদরৎ আর তাঁহার দীন-ইস্‌লামের পবিত্র প্রভাবের ফল। সে প্রভাবের সম্মুখে কোন্ কালে অপবিত্রতা দাঁড়াইতে পারিয়াছে?

ধর্ম্মপ্রাণ গাজী সাহেবের আদেশে মুফ্‌তী সাহেব সন্ন্যাসী-দিগকে প্রথমে যথানিয়মে তওবা * করাইয়া লইলেন, পরে কলেমা শরিফ পড়াইয়া ইস্‌লামে দাখিল করিলেন। তৎপরে হর্ষ-ফুল্ল-মুখে কহিলেন,—"ভাই সকল! আজ দয়াময় আল্লাহ্-তা'লা তোমাদের কুপথ হইতে সুপথে আনিলেন,—তোমরা মুসলমান হইলে। ইস্‌লাম কি, ইস্‌লামের এবাদৎ-আরাধনার নিয়ম কি, কি করিলে মুসলমানত্ব বজায় থাকে, ক্রমে তাহা জানিতে পারিবে। এখন মোটা-মুটি কিছু নসিহৎ করিতেছি, হামেহাল ইয়াদ রাখিবে। এক অদ্বিতীয় নিরাকার আল্লাই মুসলমানের

* কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং পুনর্ব্বার অপরাধের কার্য্য না করিবার দৃঢ়তা।

উপাস্য। তিনি ভিন্ন উপাসনার যোগ্য কেহই নয়—পীর-পয়গম্বর নয়, চাঁদ-সূর্য্য নয়, গঙ্গা-যমুনা নদী, গাছ-পালা বা মানুষের হাতে-গড়া দেব-দেবী কিছুই নয়। আল্লাহ্ মহান্, আল্লাহ্ অসীম, দয়াময় ও সর্ব্ব সদ্‌গুণের আধার। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ সর্ব্বজ্ঞানময় এবং সমুদয় প্রশংসাই আল্লার। তাঁহার অংশ নাই—অংশী নাই, পিতা নাই, পুত্র নাই। পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশ তাঁহারই হাতে। তাঁহার শক্তি অসীম! তাঁহারই শক্তিতে এই দুনিয়া, স্বর্গ, নরক, মনুষ্য, জেন-পরী, পশু-পক্ষী, নদী, পর্ব্বত, গাছ-পালা প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তিনি সৃষ্ট নহেন, তিনি আদি—তাঁহা হইতেই সব সৃষ্ট। তাঁহারই শক্তিতে বাতাস বহিতেছে, চাঁদ-সূর্য্য উঠিতেছে, রাত-দিন হইতেছে, মেঘে পানি ঢালিতেছে, ফল-শস্য, শাক-সব্‌জী জন্মিতেছে, জীব-জন্তু তাহা খাইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। ভাই সকল! ইহার নাম ইস্‌লাম-ধর্ম্ম। পবিত্র কোরাণ এই ধর্ম্মের বিধান-গ্রন্থ। কোরাণ আল্লার আদেশ-বাণী—সত্য পথের সহায়। কোরাণ শিখায় খোদা-তা'লার নৈকট্য লাভ করিতে—কোরাণ শিখায় খোদা-তা'লার প্রেম-যোগ সাধিতে। আরব-রবি পুণ্যশ্লোক হজরত মহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) আল্লার রসুল। এই সকল সরল-ভাবে দেল-জান হইতে সকলে বিশ্বাস করিবে। এই বিশ্বাস নারী-পুরুষ যিনি করেন, তিনিই মুসলমান। কিন্তু কেবল বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; এই বিশ্বাসের উপর নামাজ, রোজা, হজ, জাকাৎ প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ও রোমজানের রোজা মুসলমান-নামধারী

আওরত-মর্দ্দের পক্ষে ফরজ—অবশ্য পালনীয়। নামাজ কোন অবস্থাতেই ছাড়িতে পারিবে না—বেমার হইলেও শরীরের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া সাধ্যপক্ষে নামাজ আদায় করিতে হইবে; নামাজই ধর্ম্ম-ঘরের খুঁটি। নামাজের আগে অজু করিতে হইবে। অজুর উদ্দেশ্য কেবল হাত-পা-মুখাদির ধূলা-ময়লা ধুইয়া ফেলা—পরিষ্কার করা নয়, ইহাতে মনের ময়লাও কাটিয়া যায়—হাত-পা-মুখ দিয়া যে সব কুকাজ হইতে পারে, তাহাও ধুইয়া ফেলিলাম—ত্যাগ করিলাম, অজু-কালে ইহাও অন্তরে ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে। ত্রিশ রোজা রাখা সাবালক আর নীরোগ লোকের উপর ফরজ। হজ আর জাকাৎ গরীবের পক্ষে নয়, ইহা মালদার লোকে পালন করিবে। ইহা ছাড়া হালাল-হারাম বাচ-বিচার আছে, ক্রমে সব জানিতে পারিবে।"

প্রবীণ মুফ্‌তি সাহেব ইহা বলিয়া নীরব হইলে সন্ন্যাসিগণ উচ্চকণ্ঠে আনন্দের সহিত বলিলেন,—"আহা কি মধুর! আহা কি জীবন্ত ধর্ম্ম! কি সুধাময় উপদেশ!! আমরা আজ ইস্‌লাম কবুল করিয়া ধন্য হইলাম! আমাদের জ্ঞান-চক্ষু আজ ফুটিল—আঁধার হইতে আলোতে আসিয়া আমরা জন্ম সফল করিলাম। হুজুরের উপদেশ আমাদের শিরোধার্য্য।"

নব-দীক্ষিত মুসলমানগণের মুখে এই কথা শুনিয়া সকলের অন্তর আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। তখন মুফ্‌তি সাহেব প্রফুল্ল-মুখে হাত তুলিয়া মোনাজাত করিলেন, অন্য সকলে এবং শর্ম্মা ঠাকুরের ইঙ্গিতে নবদীক্ষিতগণও দুই হাত তুলিয়া "আমিন,

আমিন" বলিতে লাগিলেন। দৃশ্যটী কি সুন্দর! কি প্রাণ-স্পর্শী!! নগরবাসী অনেকে তাম্বুর আশে-পাশে পথ-ঘাট জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল। অনেকে তাম্বুর দিকে মাথা নত করিয়া দুই হাতে নমস্কার করিল। কেহ কেহ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"ঐ—ঐ যে নেড়া-মাথার দল, উহারাই জটাজুট-ধারী সন্ন্যাসী ছিল, গাজীর মাহাত্ম্য দেখে কামিয়ে-জমিয়ে মুসলমান হ'য়েছে—জাত্ দিয়েছে।"

এ কথাটী অনেকের ভাল লাগিল না! কেহ সেই নবীন মুসলমানগণকে ঘৃণা করিল, কেহ 'কি অন্যায়—কি অন্যায়' বলিল, কেহ দরবেশ জাফর খান গাজীর উপর মনে মনে একটু বিরক্ত হইল; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিল না।

জন কয়েক লোক ভিড় ঠেলিয়া তাম্বুর সম্মুখে আসিয়া নম্র-ভাবে বলিল,—"আপনাদের স্তবটী অতি মধুর, বড়ই মূল্যবান।"

গাজী সাহেব শর্ম্মা ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া কহিলেন,—"ইহারা কি বলে?"

শর্ম্মা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি ব'লচ?—কি চাও?"

"আপনাদের গঙ্গার স্তবটীর তুলনা নাই, স্তবটী বড়ই মনে লেগেছে। আমরা সেই স্তবে জগজ্জননী জাহ্নবীর পূজা ক'র্তে চাই, যদি দয়া করে শেখান।"

শর্ম্মা হাসিয়া বলিলেন,—"ওঃ! তোমরাও দেখ্চি, গঙ্গা মাতাকে দেখ্তে চাও! উত্তম! শেখাতে আপত্তি নেই। কিন্তু মুখে ব'ল্লে কি শিখ্তে পারবে?"

"আজ্ঞে, আমরা লিখে নিতে চাই ; কাগজ-কলম এনেছি।"

শর্ম্মা। "বেশ বেশ ! কিন্তু তোমাদের লিখ্‌তে দেরী হবে, আমাকে কাগজ-কলম দাও, লিখে দিচ্চি।"

"তা হ'লে তো ভালই হয়" বলিয়া আগন্তুকগণ শর্ম্মা ঠাকুরকে কলমাদি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শর্ম্মা ঠাকুর মুচকি মুচকি হাসিয়া কাগজ-কলম ধরিলেন ; তাঁহার হাসির কারণ—গঙ্গা-দর্শনের রহস্যটী মোস্তফা খান সিক্ত বস্ত্রে ফিরিয়া আসিবার পরেই তাঁহার মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রকাশ করেন নাই। কেহ গঙ্গা-দর্শনের কথা তুলিলেও কিছু বলিতেন না।

শর্ম্মা গঙ্গার স্তবটী সংপূর্ণ লিখিয়া আগন্তুকগণের হস্তে দিলেন। সাত রাজার ধন এক মাণিক পাইলে লোকে যত না খুশী হয়, তাহারা স্তবটী পাইয়া ততোধিক খুশী হইয়া প্রস্থান করিল। অমনি 'আমাকে লিখে দিতে হবে,' 'আমি উহার নকল চাই,' 'আমাকে দিও, লিখে নেব,' এইরূপ কথায় শোর-গোল করিতে করিতে লোকের ভিড় তাহাদের পিছনে ছুটিল। গঙ্গা-ভক্ত নগরবাসীদের উহা আদরের সামগ্রী হইল, শত শত লোক সে স্তব কণ্ঠস্থ করিয়া গঙ্গা-পূজায় প্রবৃত্ত হইল ; সোমেশ্বর শর্ম্মার গুরুদেবের স্তব শেষে "দরাফ খাঁর স্তব" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, আজও সে ধাঁদাময় প্রসিদ্ধির হাত হিন্দু-সমাজ এড়াইতে পারেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মসৃজিদাদির পত্তন

এই ঘটনার পর কয়েক দিন গত হইয়া গিয়াছে। নগরবাসীদের আন্দোলন কিছু মন্দীভূত হইলেও দীন-দুঃখী-ভিখারী ও নানা স্থান হইতে নানা রোগগ্রস্ত লোকের আমদানী-স্রোত বাড়িয়া গিয়াছে। তাহারা প্রতিদিন গাজী সাহেবের করুণাপ্রার্থী হইয়া আসিতেছে, দয়ালু গাজী সাহেবও দীন-দরিদ্রদিগকে পয়সা-কড়ি, রোগী লোককে ঝাড়-ফুঁক, পানি-পড়া প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিতেছেন!

পঞ্চম দিবস বৈকালে পাণ্ডুয়া হইতে ধর্ম্মবীর শাহ্ সফি-উদ্দীন কয়েক জন সহচর সহ অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গাজী সাহেব তাঁহাকে সমাদরে আনিয়া তাম্বুর ভিতর বসাইয়াছেন। ভক্তি, প্রীতি, সম্মান, আনন্দ-উচ্ছ্বাস সকলের অন্তর ছাপাইয়া উঠিয়াছে, হাসি সকলের অধরে লাগিয়াই রহিয়াছে।

শাহ্ সফিউদ্দীন তাম্বুর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন। উপরে রাস্তা, রাস্তার দুই ধারে গাছের সার, সামনে শ্যামল-সুন্দর দূর্ব্বাদলে-ঢাকা বিশাল ভূমি। তাহার পরে দরিয়া—দরিয়া ছোট-বড় ঢেউ তুলিয়া কুলু-কুলু নাদে আপন মনে ছুটিয়া যাই-তেছে। স্থানটী মাধুর্য্যে ভরা! শাহ্ সফি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; ভাগিনেয়কে হাস্যমুখে কহিলেন,—"জাফর! আল্লাহ্ তোমার

উপর খুব মেহেরবান, তোমার খোশ্‌নাম হ'য়েছে, তোমার গুণে অনেক হিন্দুও তোমার উপরে খুশী আছে। আল্লা তোমারে অতি সুন্দর জায়গাটী দিয়েছেন। আমি পাণ্ডুয়ায় তোমার লোকের মুখে শুনে যত না খুশী হয়েছিলাম, এখন নিজের চোখে দেখে যার-পর-নাই আনন্দ পেলাম। এমন সুন্দর—এমন দেল-পসন্দ জায়গা আমি আর দেখি নাই।"

গাজী সাহেব শাহ্‌ সফিউদ্দীনকে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন,—"এ আল্লার দয়া আর আপনার দোওয়াতেই হ'য়েছে মামুজি! এখন এখানে ইস্‌লাম-জারির জন্যে যা কিছু করা উচিত, তার বিলি-ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

ইহা শুনিয়া শাহ্‌ সফিউদ্দীন বলিলেন,—"আমি পাণ্ডুয়ায় মস্‌জিদ, মিনার, হুজ্‌রা, তালাব তৈয়ার করাইতেছি—মোসা-ফের-খানা, হাম্মাম ও আর আর কুঠরীও বানাইতেছি। তোমার এখানেও কিছু কিছু হওয়ার দরকার; তা তুমি কি ক'রতে চাও, বল দেখি?"

গাজী জাফর খান বলিলেন,—"মামুজি! এখানে মস্‌জিদ, মোসাফের-খানা, মিনার, নিজের হুজ্‌রা আর আমার এই লোকদের বাসের জন্যে কয়েকটী কুঠরী আর বাবুর্চ্চি-খানা হয়, এই আমার ইচ্ছা।"

"উত্তম—উত্তম! খোদা তোমার ইচ্ছা পূরা করুন, তোমার কথা আমার খুব পসন্দ হ'য়েছে। কিন্তু মাল-মশলা? ইট, পাথর, চূণ, লোহা-লক্কড়ের যোগাড় কি এখানে হবে?"

এই সময়ে নবদীক্ষিত মুসলমানগণ যুক্তকরে কহিলেন,—

"হুজুর, মাল-মশলার অভাব এখানে হবে না, এদেশের ময়দানে-জঙ্গলে বহুত ইট-পাথর প'ড়ে আছে।"

শাহ্ সফি বলিলেন,—"কে তার মালিক? কে সেই ইট-পাথর বেচ্‌তে পারে?"

নবদীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে এক জন দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"হুজুর! তার মালিক এখন আল্লা। সে ইট-পাথর হিন্দুরা নেয় না।"

"কেন নেয় না?—ইট-পাথরের কি দোষ, বল দেখি?"

"হুজুর! পূর্ব্বকালে এ দেশে কেবল হিন্দুরই রাজত্ব ছিল,—হিন্দু রাজা, হিন্দুই প্রজা। হিন্দুর দেব-দেবীর মন্দিরের সংখ্যা ছিল না। পরে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন জোর ধ'রে ওঠে, তখন বুদ্ধের ভক্তগণ হিন্দুর সেই সব দেবমন্দির ভেঙ্গে-চুরে সেই মাল-মশলায় নিজেদের মঠ তৈয়ার করে;—মঠ বৌদ্ধদের এবাদৎ-খানা। বহু কাল পরে দুর্ব্বল হিন্দুরা আবার যখন জোর ধ'রে মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠে—বৌদ্ধরা নরম পড়ে, তখন হিন্দুরা প্রতিশোধ তোলে—সেই সব বৌদ্ধ-মঠ ভেঙ্গে-চুরে খানে-খারাব—নাস্তা-নাবুদ করে। কতক কতক ইট-পাথর নিয়ে আবার দেবতার মন্দির বানায়—বেশীর ভাগ প'ড়েই থাকে,—আজ অবধি সে ইট-পাথর খৈ-ছড়ান মত প'ড়েই আছে। তার আর কেউ মালিক নেই—দেবতার মন্দিরের ইট-পাথর নিলে অমঙ্গল হবে ব'লে কেউ তা ছোঁয় না। আমরা সন্ন্যাসীরা কখন কখন সেখানে যেতাম—আমরা সব জানি। সেই সব ইট-পাথর নিলেই কাজ হবে।"

ইহা শুনিয়া শাহ্ সফিউদ্দীন সাহেব বিস্মিত হইলেন;

বলিলেন,—“এমন ? তবে তো হিন্দু-বৌদ্ধে মারা-মারি কাটা-কাটিও খুব হইছিল! সে যাই হোক, বুঝলাম, সে সব এখন বে-ওয়ারিশ। বে-ওয়ারিশ মাল-মশলা আল্লার কাজে লাগান যাইতে পারে।”

আর এক জন নবদীক্ষিত মুসলমান উৎসাহ-ভরে বলিলেন,—“সে সব ইট-পাথরে যদি না ফুলায়, তবে পাহাড়পুর আর দ্বার-বাসিনীর জঙ্গলে তিন চারিটী শিবের মন্দির আছে, মন্দিরে শিব আছে, পূজো হয় না, বাঘ-ভালুকের ভয়ে সেখানে কেউ ঘেঁষে না; এখন সেই সব মন্দিরে পেঁচা-চামচিকে, ইঁদুর-শেয়ালের আড্ডা হ'য়েছে, সেই মন্দির ভেঙ্গে আন্‌লেই হবে।”

“হাঁ—হাঁ, সেই সব মন্দিরে ইট-পাথর ঢের আছে। লোক-জন নিয়ে গিয়ে আমরাই সে সব ভেঙ্গে আন্‌তে পারব।” অপর নব মোস্‌লেমগণ স্ফূর্ত্তির সহিত একবাক্যে ইহা বলিলেন। দরবেশপ্রবর শাহ্‌ সফিউদ্দীন তখন সকলের পরামর্শ লইয়া বলিলেন,—“জাফর, শুভ কামে দেরী করা ভাল নয়। আজ রাজমিস্ত্রী, কারিগর, মজুর, গাড়ী ও আর-আর যে-জিনিসের দরকার, সব ঠিক ক'রে ফেল। কাল ফজরের নামাজ বাদ ইমারৎ আরম্ভ করা যাবে।”

ত্রিবেণী সহরে তখন নানা শ্রেণীর বহু শ্রমজীবী লোকের বাস ছিল। সুতরাং কোন জিনিসের জন্য বেগ পাইতে হইল না। নবদীক্ষিত মুসলমানগণ আর হিন্দু ভক্তদের যত্নে সমস্তই যোগাড় হইল।

পরদিন ভোরে সাধন-ভূমির চারিদিকে গাড়ী-গাড়ী ইট-

পাথর, চূণ-সুরকী পড়িতে লাগিল—স্তূপাকার হইল। হজরত শাহ্ সফিউদ্দীন সাহেব ফজরের নামাজ সাঙ্গ করিয়া তথাকার তাম্বু উঠাইয়া দিলেন—জমি খোলাসা হইল। তখন তিনি জাফর খান গাজী, মুফ্তী সাহেব, সর্দ্দার সাহেব, শর্ম্মা ঠাকুর এবং অন্যান্য নব মোস্লেম ও রাজমিস্ত্রীদের লইয়া মসজিদের ভিত্তি-পত্তন ও আর যে সব ইমারৎ হইবে, তাহারও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

তৎকালে এদেশের হিন্দু-রাজমিস্ত্রীরা ইস্লামী ইমারৎ কি ধরণে নির্ম্মাণ করিতে হয়, জানিত না। তাই শাহ্ সফিউদ্দীন সাহেব ইমারতী কাজে দক্ষ রোকনোদ্দীন রোকন খান সর্হতীর উপরে মসজিদাদি নির্ম্মাণের তাবত ভার দিয়া পাণ্ডুয়া যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

লীলাবতীর প্রাণের কথা

লীলাবতী বামার স্কন্ধে ভর দিয়া নতমুখে ধীরে ধীরে বাড়ী আসিল---স্রোতের মধ্যে হাত-পা ছুটাছুটি করিয়া, নাকানী-চুবানী খাইয়া তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বামা তাহার সর্ব্বাঙ্গের পানি ও বেণী-বন্ধন খুলিয়া কেশগুচ্ছ উত্তমরূপে মুছাইয়া দিল এবং ভিজে কাপড় ছাড়াইয়া কক্ষের মধ্যে শোওয়াইল। শীত বোধ হওয়ায় আর একখানি কাপড়ে তাহার আকণ্ঠপদতল ঢাকিয়া দিল। ব্রাহ্মণী কন্যার পার্শ্বে চাপিয়া বসিয়া স্নেহভরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সঙ্গে যে সব স্ত্রীলোক আসিয়াছিল, তাহারা অনেকে চলিয়া গেল—দুই এক জন থাকিল। বামা চিন্তিতচিত্তে গৃহস্থালীর কাজে মন দিল।

বহির্বাটীর দিকে মিশ্র ঠাকুর বাদলদাস-প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া দাওয়ায় বসিলেন। এক এক করিয়া পাড়ার লোক অনেকে জুটিল—অনেক কথা হইতে লাগিল। অনেকে লীলার উদ্ধার-কর্ত্তার প্রশংসা শতমুখে করিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"বলিহারি যাই সাঁতার-কাটার কৌশল! সাঁতার কাট্‌তে এমন আর কারেও আমি কখ্‌খন দেখিনি।" কেহ বলিল,—"ঈশ্বর কি বল-ই তার শরীরে দিয়েছেন।" কেহ বলিলেন,—"লোকটী যেই সেখানে ছিল, তেই মেয়েটী বেঁচেছে।" কেহ

আবার বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"তোমরা যাই বল না কেন, আমি ও সব শুন্‌তে চাইনে,—এ সেই ঈশ্বরের দয়া আর এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুণ্যির জোরেই হ'য়েছে।"

মিশ্র ঠাকুর ইহা শুনিয়া বলিলেন,—"বাপু হে! আমার পুণ্যি-টুণ্যি কিছুই নয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর দশ জনের আশীর্ব্বাদে আমার মেয়েটী রক্ষা পেয়েছে। আহা, যে যুবাটী আমার কন্যাকে উদ্ধার ক'রেছে, হোক সে মুসলমান, তার উপর আমার পুত্রাধিক স্নেহ জন্মেছে। তার ধর্ম্ম-জ্ঞান আর সৎ সাহসের তুলনা নাই।"

"স্নেহ-ভক্তি যে হবারই কথা—হওয়াই তো উচিত। যে লোক বিপদে সহায় হয়, তার চেয়ে কি বন্ধু আছে? তারে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে।" ইহা বলিয়া অনেকে মিশ্র ঠাকুরের কথার পোষকতা করিলেন!

অন্দরমহলেও জনতা—অনেক রমণী সেখানে জুটিয়াছে। লীলাবতীর গঙ্গাডুবীর খবর পাইয়া পাড়ার কুল-কামিনীরা, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কারা আসিয়া লীলার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। তাহারা লীলাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল—কত জনে কত কথা তুলিল। কত আহা-উহু, কত দেবতার দয়ার কথা, কত বিচার-মীমাংসা, আন্দোলন-আলোচনা চলিল। একটী বালিকা লীলাবতীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—"হ্যাঁ নীলি দিদি! কি ক'রে ডুব্‌লি?" লীলা চক্ষু মেলিয়া বালিকার দিকে চাহিল; কোন উত্তর করিল না।

এই সময়ে একটী প্রৌঢ়া রমণী বলিলেন,—"এখন ওরে

আর কিছু ব'ল না, ও ঘুমুক। চল্, আমরা বাড়ী যাই। ইন্দু!—ও সরলা, ওঠ্ না, আয়—আবার কাল আসিস্।"

এই কথায় নারী-মজলিস্ ভাঙ্গিল। ইন্দুমতী, সরলা, মোক্ষদা, সৌদামিনী, বিধুর মা, রামীর পিসি, তাম্‌লী বৌ, ক্ষান্ত দিদি প্রভৃতি সকলে একে একে চলিয়া গেল।

মিশ্র ঠাকুর সকলকে বিদায় দিয়া কন্যার কক্ষে আসিলেন—কন্যার তত্ত্ব লইয়া পুনঃ নিজ কক্ষে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রে লীলাবতী একটু গরম দুধ ভিন্ন আর কিছুই খাইল না। বামা বাহিরের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া লীলাবতীর তথ্‌ত্‌পোষের নিকটে বিছানা পাতিয়া শুইল, ব্রাহ্মণী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরিত থাকিয়া শেষে আপন শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিছু ক্ষণ অগ্রে যে স্থান লোক-কোলাহলে গম্ গম্ করিতেছিল, এখন তাহা নীরব—নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল।

মানব-মস্তিষ্কের স্মৃতি একটী অপূর্ব্ব পদার্থ! সেটী মানব-মনের অতীতের আয়না। এই আয়নায় যদি কেহ উঁকি মারিয়া দেখে, তবে সে অতীত-জীবনের ভাল-মন্দ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সুন্দর-কুৎসিত সমস্ত ঘটনাই—সমস্ত কাজের চিত্রই দেখিতে পাইবে। ঐ যে রমণী পাপের মোহে মজিয়া, কলঙ্ক-পসরা মাথায় লইয়া এখন চক্ষের জলে বক্ষ ভিজাইতেছে, ঐ যে ধনী-নন্দন যৌবন-মদে মত্ত হইয়া অসৎ পথে ধন উড়াইয়া দিয়া এক্ষণে পথের ফকির,—"হায়! কি কুকাজ-ই করিয়াছি" বলিয়া অনুতাপ করিতেছে, আর ঐ যে বৃদ্ধ কোন্ কালে কোন্ জ্বলন্ত গৃহের ভিতর হইতে কোন্ শিশুকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া আজও আন-

ন্দিত ও গৌরব-মণ্ডিত হইতেছেন, এ সব-ই এই আয়নায় দৃষ্টি-পাতের ফল! পাঠক! একবার সেই আয়নায় লক্ষ্য করুন, আপনার চক্ষে আপনার ন্যায়-অন্যায়, সুখ-দুঃখ, অনুরাগ-বিরাগের তাবৎ দৃশ্যই পরিস্ফুট হইবে—আপনি সমস্তই দেখিতে পাইবেন।

লীলাবতী তখনও ঘুমায় নাই। যাহার প্রাণে দারুণ চিন্তা, তাহার কি ঘুম আসিতে পারে? লীলাবতী নীরবে শুইয়া স্মৃতির আয়নায় অতীতের দৃশ্য দেখিতেছে। তখন তাহার সমস্ত মনটা যে কোথায় কি অবস্থায় অবস্থিত, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, তিনিই তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

লীলাবতী গঙ্গার ঘাটের ঘটনা তোলা-পাড়া করিতেছে। নিজের লাঞ্ছনার কথা একটীবারও মনে হইতেছে না; মনে হইতেছে কেবল সেই সুঠাম সুন্দর মুখখানি—ঘাটের উপরে চাহিতেই যে হৃদয়-হারী—যে প্রেম-পূর্ণ চন্দ্রবদন দেখিয়াছিল, সেই মাধুরী-মাখা বদনখানি, সেই কোন্ স্বর্গের কোন দেবতার আলো-করা মুখখানি! আর মনে পড়িতেছে সেই সুখের শয়ন—পাথারে ভাসিয়া, হাবুডুবু খাইয়া শেষে এক দেব-দুর্লভ সুকোমল বক্ষে শয়ন! আহা কি সে শয়ন! সে শয়নের তুলনা এ জগতে কোথায়? রাজাধিরাজের দুগ্ধ-ফেন-নিভ কুসুম-কোমল শয্যায় শয়ন, এ শয়নের নিকট অতি তুচ্ছ—অতি হেয়! স্বর্গের দেবতাদের অনাবিল অনন্ত সুখ, এ শয়ন-সুখের কাছে হীন—তুচ্ছ! আহা, যখন সেই বক্ষের উপরে শুইয়া নিজের মুখখানি উঁচু করিয়া সেই দেবতার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সে কি শুভ মুহূর্ত্ত! আর সেই বক্ষে এই

বক্ষের সম্মিলন? সেই বুকে বুকে সুখের অদল-বদল—সুখস্পর্শ মিলন? সে মিলন কি সুখদ!—কি স্নিগ্ধ সম্মোহন-ভাবে ভরা!! সে মিলন তাহার প্রাণের ভিতরে, হৃদয়েব পরতে পরতে, দেহের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে কি এক সুখের তরঙ্গ ছুটাইয়া দিয়াছিল।

লীলাবতী আর ভাবিতে পারিল না। এই টুকু মনে করিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল; সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাশ ফিবিয়া শুইল। বামাও চিন্তা-বিজড়িত চিত্তে শুইয়াছিল, তাহারও তেমন গাঢ় নিদ্রা হয় নাই। লীলাবতীর পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে তখ্‌ত্‌-পোষ নড়িয়া উঠিতেই সে বলিল—"সই!"

তাহার সই মৃদুস্বরে বলিল,—"আমার কাছে এস।"

বামা তন্দ্রার ঘোরে শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে তখ্‌ত্‌-পোষের উপরে গেল। আঁধাবে হাত বাড়াইয়া দিতেই লীলাবতীর মুখে তাহার হাত পড়িল,—দেখিল লীলাবতীর চক্ষু অশ্রু-সিক্ত; অমনি বলিল,—"সই! তুমি কাঁদ্‌চ? টানা-হিঁচ্‌ড়া হওয়ায় তোমার কি কষ্ট হ'চ্চে?"

লীলাবতী বামাকে টানিয়া নিজের কাছে শোওয়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"আর কি কষ্ট সই? যে কষ্ট বিধাতা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমার আর কি কষ্ট!"

এ কথায় বামা বুঝিল, লীলাবতী জলে ডুবিয়া যে কষ্ট—যে টানা-হিঁচড়ার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার কিছু মাত্র যায় আসে নাই; তাহার যে প্রবল অনুরাগ, যে অফুরন্ত

কামনা, সেই কামনা-জনিত দুঃখেই সে মহাদুঃখিত। তাই বামা মনে মনে হাসিয়া বলিল,—"কেন সই! সে কষ্ট তো তোমার ঘুচেছে? মন যারে চায়, যার জন্যে প্রাণ পাগল, তার বুকে যখন ঠাঁই পেলাম, তখন আর কষ্ট রইল কোথায় সই?"

"সই ক্ষণেকের সুখ কি সুখ? যে পিয়াস সাত সাগরের জল ঢাল্‌লেও মেটে না, তা কি এক ফোটা ধারা-জলে দূর হয় সই? তুমিই তো বল—শিশিরে কি মিটে সাধ বিনা বরিষণে। সই, বিজলী ন'ল্‌পে নিবে গিয়েছে, এখন যে আমারে ঘোর আঁধারে ঘিরেছে! আমার অন্তর শ্মশান!—প্রাণের ভেতর ধূ ধূ আগুন জ্বলে উঠেছে। তবে তোমার......"

আর বলা হইল না, বাহিরে কাহার পদ-শব্দ শ্রুত হইল; কে দাওয়ায় উঠিল, জানালায় মুখ দিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে "বামা—ও বামা!" বলিয়া ডাকিয়া নীচে নামিয়া গেল।

দুই সই জাগরিত থাকিয়াও উত্তর দিল না;—বুঝিল, মা ডাকিতেছেন। ব্রাহ্মণীর এইরূপে কন্যার খোঁজ-খবর লওয়ার অভ্যাস ছিল।

ব্রাহ্মণী চলিয়া গেলে লীলাবতী আবার বলিতে লাগিল,—"সই, তোমার কথাও একেবারে মিথ্যে নয়। তোমার কাছে আমার আর লুকো-ছাপা কি? আমি আমার প্রাণেশ্বরের বুকে ঠাঁই পেয়ে ধন্য হইচি। যার মধু-মাখা মুখখানা দেখে আমি সংজ্ঞা-হারা হ'য়ে অকূল পাথারে ভেসেছিলাম, দেহে আশ্রয় পেয়ে তাকিয়ে দেখি, আমি যে তাঁহারই বুকে!—সেই প্রেমময় বঁধুর বিলাস-শয়নে! আমি আহ্লাদে আত্ম-হারা হ'লাম, দেহ

কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। আহা কি সে সুখ—কি সে সোয়াস্তি! সই! তখন মনের ভেতর কি যে কি হ'ল, তা মুখে ব'লবার সাধ্য নেই। তখন মনে মনে ব'লেছিলাম,—শুভ ক্ষণে ডুবেছিলাম, আমার জলে ডোবা সার্থক হ'ল। এখন আমার ইচ্ছে হ'চ্চে, আবার আমি ডুবি—আবার আমার প্রাণ-বল্লভের বুকে আমার এই বুক.... ."

আর বলিতে পারিল না। বালিকার হৃদয়-মধ্যে কিসের যেন একটা তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইল,—সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

বামা তখন বস্ত্রাঞ্চলে লীলাবতীর মুখ মুছাইয়া দিয়া দুঃখ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"সই, চুপ করো। তোমার কষ্টে আমার প্রাণে যে কি কষ্ট হ'চ্চে, তা আর ব'লব কি, ভগবানই জানেন। কিন্তু তুমি অত উতালা হ'য়ো না, যে বিধেতা দুখ্‌খু দিয়েচেন, তিনিই আবার সুখ দিবেন।"

লীলাবতী বামার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আকুল-কণ্ঠে বলিল,—"সই! সে দিন কি আমার হবে?"

বামা বলিল,—"নিশ্চয় হবে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি, তোমার সুখের দিন ঘুনিয়ে এসেছে। নইলে যারে চোখের দেখা দেখ্‌বার জন্যে পাগল—রাত-দিন ভাবনা, হঠাৎ তারেই ঘাটে দেখা, আবার তারির বুকে চ'ড়ে ডেঙ্গায় ওঠা! এ অঘটন ঘট্‌বে কেন দিদি?"

বামার এই কথাগুলি লীলাবতীর প্রাণে দগ্ধ ক্ষতে শীতল প্রলেপবৎ প্রতীয়মান হইল। লীলাবতী আশ্বস্ত হইল; বুঝিল,

যখন নব ঘন উদিত হইয়াছে, তখন অবশ্যই বারি বর্ষণ করিবে। সুতরাং এখন তাড়া-তাড়ি দাপা-দাপি কবিলে কি হইবে? সে নীরবে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্মৃতির দর্পণে ভবিষ্যতের সুখের ছবি দেখিতে লাগিল। কত আশা, কত আনন্দ, কত অফুরন্ত প্রেমের অভিনয় তাহার মানস-পটে অঙ্কিত হইয়া হৃদয় অপ্রমেয় মধুর রসে অভিষিক্ত করিয়া দিল।

বামা বলিল,—"সই! অনেক রাত হ'য়েছে, আমার কথা শোন—ঘুমোও। একে জলের ভেতব হাঁচড়-পাঁচড় ক'রে কষ্ট পেয়েছ, তাতে কিছু খাও নাই; যদি না ঘুমোও, তবে কি আর দেহে দেহ থাকবে?—ঘুমোও।"

লীলাবতী আর কথা কহিল না—সইয়ের কোমল কণ্ঠ-দেশে একটী হস্ত স্থাপন করিয়া নীরব হইল; ঘুমাইল কি না, বিধাতাই বলিতে পারেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কলঙ্ক-রটনা

গণপতি মিশ্রের কন্যা লীলাবতী গঙ্গায় ডুবিয়াছিল,. লীলাবতী রক্ষা পাইয়াছে, এক জন মুসলমান তাহাকে তুলিয়াছে।—এই কথা লইয়া গ্রামে মহা হুলস্থুল উপস্থিত হইল। নানা জনে নানা রূপ কাণা-কাণি করিতে লাগিল। যাঁহারা পরনিন্দা-পরচর্চ্চায় আমোদ বোধ করেন, তাঁহাদের আর আহার-নিদ্রা নাই—লীলাবতীর কলঙ্ক রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কথাটী উঠিয়াছিল প্রথমে গঙ্গাব ঘাটে ; কে এক জন মহাবিজ্ঞ মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—"যুবতী কুমারী কন্যাকে এক জন অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষ বুকে ধরিয়া তুলিল—মেয়েটীর পরিণাম বড়ই মন্দ!" কোন কোন হিন্দুকুলসূর্য্য—যথা ফনে তাম্‌লী, যদু ঘোষ, নেপাল সরকার প্রভৃতি তাহাতে টীকা-টীপ্পনীও কাটিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, তৎকালে নারী-মুখেও একথা ফুটিয়াছিল,—"ওমা, কি নজ্জা—কি নজ্জা! সোমত্ত মেয়ে!—একটা ভিন পুরুষ টেনে-হিঁচড়ে বুকে নিয়ে উঠল! ওর কি আর জাত আছে?" এই মন্তব্য ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক বসিল। ঘরে-ঘরে, হাটে-বাজারে মেয়ে-পুরুষের মুখে আন্দোলন চলিল। হঠাৎ কুয়াশা হইলে যেমন মেদিনী-গগন আঁধারে আচ্ছন্ন হয়, লীলাবতীর কলঙ্ক-কাহিনীতে তেমনি ত্রিবেণী গ্রাম ছাইয়া গেল!

স্নানের ঘাটে স্নানকালে রমণীদের মুখে—"সোহাগী ছ' মাস পোয়াতী", "সুরবালার সোয়ামী সুরবালাকে দুই চক্ষু পেড়ে দেখ্‌তে পারে না", "ও বৌ! আছিস্ কেমন লা?" "ঘোষেদের নয়নতারা মনের মতন বর পেয়েছে", "এমন অলপ্পেয়ের হাতে দিদি পড়েছি—এক দণ্ড সুখ নেই! না আছে দু-খানা সোণা-দানা,—না আছে একখানি ভাল কাপড়! একটা মিষ্টি কথাও কি আছে ছাই?" "আজ মাছের ঝোল, মুগের ডাল আর চাল্‌তার অম্বল হইছিল, দিদি!" ইত্যাদি প্রকারের কথা আর নাই,—আজ লীলাবতীর শিরশ্চর্ব্বণ করিতেই ঘাট গুল্‌জার।

এক জন বলিল,—"ছি—ছি—ছি! কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! নজ্জায় মরে গেলাম। চোদ্দ বছরের ধাড়ী, ভরা সোমত্ত—রূপ-যৈবন ফেটে প'ড়চে, বিয়ে হ'লে তিনটে ছেলে হ'ত! সোঁতের টানে তার কাপড়-চোপড় কি আর অঙ্গে ছিল গা? কোথা-কার কোন্ মিন্‌সে—সে নাকি আবার মোচনমান—তারে উল্‌টে পাল্‌টে বুকে-পিঠে নিয়ে ডেঙ্গায় তুলেচে। পোড়া কপাল—ধিক্ তার বাঁচনে!" এই কথা শুনিয়া একটী অর্দ্ধ-বয়সী মুখরা কামিনী নাক-মুখ শিট্‌কাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"তা কি আবার ব'লে কষ্ট পাচ্চ দিদি? তার জাত্ আছে, না ধর্ম্ম আছে,—না সতীত্ব আছে! পোড়ারমুখী কোন্ মুখ নিয়ে ডেঙ্গায় উঠ্‌ল? তার ডুবে মরাই যে ভাল ছিল গা? মরণ আর কি!"

এই সময়ে গা দুলাইয়া কাপড় কাচিতে কাচিতে রঙ্গিণী বেণেনী বলিল,—"হ্যাদে আর কিছু শুনেছ কি? শুনেছি, মিন্‌সে নাকি ছুঁড়ির মুখে চুমো খেইছিল!"

ইহা শুনিয়া রমণীর দল খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির গর্‌রায় ঘাট ভরিয়া গেল। নব বধূর দল ঘোমটার ভিতর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে হাসিতে মৃদুস্বরে বলিল,—"মরণ আর কি!" কেহ দাঁতে জিভ কাটিল, কেহ বা প্রাণের ননদিনীর গা টিপিয়া মনের কথা জানাইল।

একটী বৃদ্ধা চুম্বনের কথা শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁগা! সব সময়ে কি ঠাট-তামাসা ক'রতে হয়? যা'র জ্বালা সেই জানে। একটা ঘর-গড়া কথা ব'লে মিছি-মিছি কলঙ্ক রটনা করা কি ভাল? ছিঃ—অবাক্ আর কি!"

"ওগো, ঘর-গড়া কথা নয় গো, ঘর-গড়া কথা নয়! আমি যা শুনিচি, তাই ব'লচি; এতে আমার আর দোষ হ'ল কি?" বেণেনী উচ্চ কণ্ঠে ইহা বলিয়া প্রতিবাদ করিল। সেই সঙ্গে আর একটী রমণী "হ্যাঁ, আমিও তো ও-কথাটা শুনিচি" বলিয়া বেণেনীর পোষকতা করিল।

তখন সেই বৃদ্ধা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"শোন আর যাই কর বাছা! ওটা কিন্তু নচ্ছার বেটাদের বানানো কথা। এ কি কখন হ'তে পারে গা! প্রাণ নিয়ে টানা-টানি—তার ভেতরে চুমো! তবে সে ডুবেছিল, তারে টেনে-হিঁচড়ে তুলেছে, তাই যা বল। তাতেই বা দোষটা কি? অমন টেনে-হিঁচড়ে কেউ কি কারুকে তোলে না? তাতে কি জাত যায়? এই তো বেশী দিনের কথা নয়,—ও-পাড়ার গোপাল সরকারের ঘরে আগুন লেগে কি হ'ল। ঘরের চার চালে আগুন ধূ ধূ ক'রে

জ্বল্‌তে লাগল—দাওয়ার চালাখানা পুড়ে ভেঙ্গে প'ড়ল,—ঘরের ভেতর তার যুবতী ভাদর-বৌ বেরুতে না পেরে 'মারে—বাপরে' ক'রে কেঁদে ছুটোছুটি ক'র্‌তে লাগল। চারি দিকে আগুন—কার সাদ্দি সেখেনে যায়। বুঝি আর একটু পরে ঘর খানাও ভেঙ্গে পড়ে; ছুঁড়িটা সজ্ঞানে ভস্ম হয়। এই ভেবে লোকে হায় হায় ক'র্‌তে লাগল। এমন সময়ে একটা ভোজপুরে যোয়ান আগুনের ওপর দিয়ে ছুটে ঘরের ভেতর গিয়ে সেই ভরা সোমত্ত বৌটারে বুকের ভেতর সাপ্‌টে না ধ'রে বাইরে এনে ফেল্‌লে—সে বেঁচে গেল। তাতে কি তার জাত্‌ গিয়েছে গা? তা লোকের বিপত্তির সময় মন্দ-ছোন্দ ব'ল্‌তে নেই।"

এই কথায় সকলে মুখ-ছোপ খাইয়া স্তব্ধভাব ধারণ করিল। কেহ অলক্ষ্যে ফোঁশ মারিল, কেহ বা মুখ-ভঙ্গী করিয়া বৃদ্ধার দিকে কট-মট চক্ষে চাহিল। একটী রমণী বলিল,—"পরের কথায় কাজ কি মা? বিধেতা কার ভাগ্যে কি নিকেচে, কে জানে? হরি-বোল-হরি!" বলিয়া দুই তিনটা ডুব দিয়া আড়-নয়নে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

তখন "আহা, তার বাপ-মার কি কষ্ট, অমন বিপদে যেন মানুষে না পড়ে, কি নেগ্‌গ্রই সে পেয়েচে!" ইত্যাদি বলাবলি করিতে করিতে রমণীর দল একে একে ঘাট শূন্য করিল।

গরবিণী গোয়ালিনী পাড়ায় দুধ দিয়া কক্ষে একটী দুধের কেঁড়ে—কেঁড়েব মুখে একটী ছোট্ট ঘটী লইয়া বাড়ী ফিরিতে-ছিল। এমন সময় একটী বাড়ীর খিড়কীর দুয়ার হইতে কে ডাকিল—"গরবিণী—ও গরব! শুনে যা।"

গরবিণী গোয়ালার মেয়ে—বাল-বিধবা। চেহারাটা মন্দ নয়, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। সংসারে তাহার বৃদ্ধা মাতা, একটী ছোট ভাই, আর গুটী কয়েক দুগ্ধবতী গাভী আছে। পাড়ায় পাড়ায় দুধ যোগান দেওয়াই তার কাজ। বয়স-কালে গরবিণী একটু আধটু নষ্ট-দুষ্ট ছিল বটে, কিন্তু এখন সে খাট্টী সতী! গরব ভারী বাচাল, ভারী চতুর,—গল্প পাইলে খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া যায়। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে খুব ভালবাসে।

"কেন?—গরবকে আবার কি দরকার? বেলা হ'য়েচে, কখন্ বাড়ী যাব, কখন্ নাবো, কখন্ খাবো!" ইত্যাদি আপন মনে বকিতে বকিতে গরব খিড়কী-মুখিনী হইয়া 'কে ডাকৃচে গা' উচ্চ স্বরে বলিতেই খিড়কীর ভিতর হইতে দুই তিনটী যুবতী রমণী তাহকে হাত-ছানি দিয়া ডাকিল। গরব দরজার ভিতরে ঢুকিল। 'গরব! অনেক দিন তোরে দেখিনি—আয়, একটু বোস্' বলিয়া যুবতীরা গরবিণীকে দাওয়ায় লইয়া গেল।

"বস্‌বার কি সময় দিদি! তোমাদের মতন তো আমি নই, যে খেয়ে-দেয়ে তখ্‌ত্‌পোষে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে থাকৃব—আমার ঢের কাজ আছে।" বলিয়া গরব সম্মুখে কেঁড়ে রাখিয়া ধীরে ধীরে বসিল।

একটী রসিকা অধরে মৃদু হাসি লাগাইয়া কহিল,—"কেন গরব! তুইও তো চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাক্‌তে পারিস্?"

"বটেই তো; তোমাদের মতন আমার একটা কত্তা আছে যে, তাই সে আমার মন যোগাবে! খাওয়া-পরা গয়না-গাঁটি দেবে, আর আমি সুখের দোলায় দুল্‌ব।"

গরবিণীর এই কথায় সকলে খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। গরবের গলা শুনিয়া প্রতিবেশিনী তিন চারিটী রমণী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তন্মধ্যে একটী পরিহাস-পটু রমণী বলিল,—"একটা কত্তা কল্‌লেই তো পারো!"

গরব চটিয়া উঠিল, ড্যাবডেবে চক্ষু দুটী বাহির করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"গরবের মুখে দু-কথা শোন্‌বার বুঝি সাধ হ'য়েছে? বলে, যার মনেতে যে ঢেউ ওঠে, তার মুখেতে তাই যে ফোটে! গরবিণীকে——"

"ওলো থাম্—থাম্, চটিস্ কেন? তোরে নিয়ে রং-তামাসা করে ব'লেই কি চ'ট্‌তে হয়?" বলিয়া একটী রমণী বাধা প্রদান করিল।

গরবিণী হাসিয়া বলিল,—"চট্‌বার কথা হ'লেই চ'ট্‌তে হয় দিদি। যাক্—বলি গরবিণীকে এত বেলায় কি এই ক'ত্তে ডাকা হ'য়েছে? নিজেরা খেয়ে-দেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়েছে কি না? আর থাক্‌ব না—আমি চল্লাম।" ইহা বলিয়া গরবিণী দুগ্ধ-ভাণ্ড লইতে উদ্যত হইলে অমনি একটী যুবতী ধাঁ করিয়া কেঁড়ে লইয়া ঘরের ভিতর রাখিয়া দিল। গরব বলিল,—"তোরা কি আমারে নাইতে-খেতে দিবি নে? ঝকমারি ক'রে এইছিনু!"

যুবতী বলিল,—"যাস্ খুনি, আর একটু বোস্। ও সব কথা যাক্; বলি গরব! বামুনদের মেয়ে-ডোবার খবর কিছু জানিস্?"

গরবিণীর রাগ-ঝাল নিবিয়া গেল—উত্তমরূপে দাওয়ার একটী খুঁটী ঠেস দিয়া বসিয়া নরম সুরে বলিল,—"জানি বৈ কি?

সে যে আমার চক্ষের দেখা! তারে যখন ডেঙ্গায় তুল্‌লে, আমি যে তখন সেখেনে দাঁড়িয়ে! আহা ছুঁড়ির রূপের কথা আর কি ব'লব,—যেন সাক্ষাৎ দুগ্‌গো পিত্তিমে। তারে যখন বুকে নিয়ে সাঁতার দিতে লাগল, তখন গঙ্গার ধারে মানুষের ভিড় কত! ঘাটের কাছে তারে আন্‌লে দেখি,—সে উলঙ্গ দিদি—খাট্টী উলঙ্গ! তাব মুখ-বুক খোলা, কাপড়খানা কোমরে আট্‌কে ছিল মাত্তর। দেখে নজ্জায় আর বাঁচিনে।"

"আচ্ছা গরব! তার বয়েস কত?"

"আরে সে ভরা সোমত্ত;—বিয়ে হ'লে ছেলের মা হ'ত।"

"বলিস্ কি গরব! এত বয়সেও তার বিয়ে হয়নি? এমন ধাড়ী আইবুড় মেয়ে বাপ-মা ঘরে কি ক'রে রেখেচে? ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জা!" ইহা একটী অর্দ্ধ-বয়সী রমণী তর্জ্জনী কপোলে ঠেকাইয়া বিস্মিত ভাবে বলিল।

তখন আর একটী পুত্রবতী বলিলেন,—"কবে আর তার বিয়ে হবে?"

"আর বিয়ে হ'য়েছে! কোথাকার একটা ভিন পুরুষে যারে ছেনে-চট্‌কে ডেঙ্গায় তুল্‌লে, তারে কি আর কেউ বিয়ে করে?" ইহা বলিয়া গরবিণী নানা অশ্লীল কথার অবতারণা করিল। রমণীর দল তৎশ্রবণে উচ্চ হাস্যে এ উহার গায় পড়িয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দিল, কেহ কেহ বা দুই একটী অশ্রাব্য বুক্‌নী কাটিয়া হাসি-তামাসার মাত্রা চড়াইয়া দিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রমণীদের ন্যায় পুরুষ-মহলেও নানা ঘোঁট উপস্থিত হইয়াছিল। কেহ বলিল,—মেয়েটার পরকাল ঝর-ঝরে

হ'য়ে গেল। একে ভিন্ন পুরুষ, তাতে আবার মোচোলমানের সংস্পর্শ! তার তো সতীত্ব নেই-ই, জাত্-ও কি ছাই আছে!"

অন্য এক জন বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে বলিলেন,—"আচ্ছা, অনেক লোক তো গঙ্গার তীরে জুটেছিল, তাবা কি কেউ সাহস ক'রে জলে নেবে মেয়েটীরে উদ্ধার ক'রতে পারেনি? আর যদি নাই পারল, তবে সেই মোচোলমানটারে বাধা দিলেই তো সব আপদ চুকে যেত! মেয়েটা ডুবে ম'লেও যে ভাল ছিল।"

"তা হ'লে তো কথাই ছিল না, কিন্তু বুঝে দেখ দিকি, সে মোচোলমানটা বা এর ভেতর আসে কেন? তার এমন কি দায় পড়েছিল যে, অত লোক থাক্‌তে সে কেন প্রাণের ভয় না ক'বে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ল? বোধ হয়, এর ভেতর কিছু ঘটনাঘটন আছে!"

এই কথায় একটা প্রবীণ পুরুষ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"আরে ছি ছি ছি!—কি কথা কও হে? এ'কি হ'তে পারে? যে সব মুসললমান এখানে তাম্বু ফেলে আছে, তারা অতি ধার্ম্মিক, অতি পবিত্র! তারা বিপদে লোকের উপকারই করে। তারা কি মন্দ কাজে থাকে? আর মিশ্র ঠাকুরের মেয়েটারেও আমি জানি! সে অতি নম্র—অতি সুশীলা, মুখ তুলে কারুর পানে চায় না। তার পক্ষে এ কথা সম্ভব হ'তেই পারে না।"

এ কথায় কয়েক জন উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"কি? সম্ভব নয়! হাটে-মাঠে, পথে-ঘাটে হাজার হাজার নারী-পুরুষের

মুখে যে এ কলঙ্কের কথা টি টি ক'রে উঠেছে ? কার মুখে থাবা দেবে ? যা রটে, তা বটে, একথা কে না জানে ?"

এইরূপ আন্দোলন-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক সর্ব্বত্রই হইতে লাগিল—ঘোঁট ক্রমেই পাকিয়া চলিল। কোন কোন নিষ্কর্ম্মা সমাজ-বাগীশ চণ্ডীমণ্ডপে নস্য টানিতে টানিতে আর্য্য-সমাজ ও আর্য্যাচার অক্ষুণ্ণ রক্ষার জন্য মস্তিষ্ক আলোড়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৃদ্ধ মিশ্র ঠাকুরের কাণে এই নিদারুণ ঘোঁটের কথা যথাকালে উঠিল—নানা ভাবে নানা দিক্ দিয়া এই বিষাদের ঝড় তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল। তিনি শুনিলেন,—সপ্তগ্রাম হইতে সেই ঘটক লীলাবতীর সম্বন্ধ লইয়া পুনর্ব্বার আসিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রামের লোকের মুখে লীলাবতীর কলঙ্কের কথা শুনিয়া তিনি আর মিশ্র ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন নাই—ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া গিয়াছেন ; বলিয়া গিয়াছেন,—"কন্যাটী সুন্দরী হইলে কি হইবে ? যে কলঙ্কের কথা শুনিলাম, তাহাতে কে এমন আছে যে, সাহস করিয়া বিবাহ করিতে পারে ?" বৃদ্ধ ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত ও ম্রিয়মাণ হইলেন। একে তিনি বৃদ্ধ, তাহাতে কন্যা-দায়, তাহার উপর আবার এক অকথ্য অপবাদ ! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লজ্জা, ঘৃণা ও অবমাননায় এত টুকু হইয়া গেলেন—কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অন্তরে পাষাণ পিষিয়া যাইতে লাগিল,—চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। প্রকৃতই ব্রাহ্মণ বিপদাপন্ন হইলেন ; তাঁহার ক্লেশের সীমা নাই, যন্ত্রণার অবধি নাই, দুশ্চিন্তার পার নাই ! তিনি মলিন-মুখে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে ভাগ্য-লিপি স্মরণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এখন উপায় ?

"এখন উপায় ?" রাত্রি প্রায় বারটা বাজিয়াছে ; চাঁদের উজ্জ্বল শুভ্র কিরণে চারিদিক ধব্-ধব্ করিতেছে। বামা তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ-কর্ম্ম সারিয়া লীলাবতীর সহিত গৃহের ভিতর শুইয়াছে। কাহারও সাড়া-শব্দ নাই। মিশ্র-পত্নী দাওয়ায় শুইয়া আছেন ; তাঁহার নিদ্রা নাই,—অবাক্-নয়নে নিথর নিস্তব্ধ প্রকৃতির দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন ? ভাবিতেছেন কন্যার কথা। কন্যার পরিণাম কি হইবে ? বিধাতা তাহার অদৃষ্টে এ অপবাদ কেন ঘটাইলেন ? এমন রূপ—এমন ঢল-ঢলে মুখ, টল-টলে আঁখি দুটী, এক ঢাল চুল—সমস্তই সুন্দর—সবই পরিপাটী, এ সব সত্ত্বেও কি লীলাবতীর বিবাহ হইবে না ? মিথ্যা কলঙ্ক কু-লোকে রটাইয়াছে ; যারা সৎ—ভাল লোক, তারা কোনও দোষ দেখিতে পান না। তবে কেন বিবাহ হইবে না। তবে কেন ঘটক ফিরিয়া গেল ? হায়, এখন উপায় ? হায় হিন্দু-সমাজ !

আবার ভাবিতেছেন,—বিবাহ অবশ্যই হবে, কিন্তু হিন্দু-সমাজে নয়। কেন নয় ? সে 'কি এই অপবাদের জন্যে ? না, তা নয়। এ অপবাদ না হ'লেও লীলার হিন্দুর ঘরে ঠাঁই হওয়ার সম্ভব নয় ! বামার কাছে তো সব টের পেইছি ? লীলা যার রূপে মুগ্ধ, যারে সে প্রাণ-মন দিয়েছে, দেহও তারে দেবে !

বামার মুখে এ সব শুনে প্রথমে মন খুব খারাব হইয়াছিল—মুসলমান বলে অশ্রদ্ধা হইয়াছিল, সে অশ্রদ্ধা আর নাই, মুসলমানকে তো চক্ষে দেখিলাম। মন্দটা কিসের ? মুসলমান বেশ—মুসলমান সুন্দর। বোধ হয়, এ মিলনও বিধাতার ইচ্ছা ! আহা লীলা—মা আমার—স্নেহের লীলা ! লীলা যাতে সুখে থাকে, তাই হোক্ ! কিন্তু উপায় ? ভেতরের খবর তো ইনি কিছুই জানেন না !

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী এইরূপ কতই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে মিশ্র ঠাকুর ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর হইতে দাওয়ায় আসিয়া ব্রাহ্মণীর শয্যায় বসিলেন, ব্রাহ্মণী তাঁহার সাড়া পাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

মিশ্র ঠাকুর বসিয়াই মৃদু স্বরে বলিলেন,—"এখন উপায় ?"

ব্রাহ্মণীর কাণে অমনি টেলিগ্রাফের যন্ত্রের ন্যায় বাজিল,—এখন উপায় ? তাঁহার প্রাণেও বাজিতেছিল,—এখন উপায় ? ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"উপায় ? আমিও তাই ভাব্‌চি ! ভেবে ভেবে কূল-কিনারা নেই। তা আর ভাবা-ভাবি মিছে, উপায় বিধেতাই ক'রবেন, তিনি যা ক'রবেন, তাই হবে। তিনি মঙ্গলময়।"

মিশ্র ঠাকুর বলিলেন,—"তা তো বটেই, কিন্তু আমাদের আর মঙ্গল কোথায় ? আমি যে দুই চক্ষে অন্ধকার দেখছি। আমার হৃদয় চূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে, আমি নৈরাশ্য-সাগরে হাবু-ডুবু খাচ্চি। প্রাণে শান্তি নেই ! ভেবেছিলাম, এই বৃদ্ধকালে লীলারে উপযুক্ত পাত্রের হাতে দিয়ে সুখী হ'ব, যে ক'টা দিন বেঁচে থাকি, ঝি-জামাই দেখে-শুনে আনন্দে কাটাব। কিন্তু সে তো

হ'ল না—আমার সে আশা-ভরসা আর কোথায় ? আমার বাড়া ভাতে ছাই প'ড়েছে ! আমি আর কোন্ মুখে সমাজের কাছে যাব ? আর কি আমার সমাজে দাঁড়াবার ঠাঁই আছে ?"

ব্রাহ্মণ ইহা বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্বামীর ক্রন্দন দেখিয়া ব্রাহ্মণী উঠিয়া বসিলেন—তাঁহার মুখে হাত দিয়া বলিলেন,—"আরে কাঁদ কেন ? কি এমন দুষ্কর্ম্ম করেছি আমরা যে তার জন্যে কাঁদচ ? আমার মেয়ে কিছু বেরিয়ে যায়নি—কি কারুর সঙ্গে ধরা পড়েনি ; ডুবেছিল, এক জন মুসলমান তারে তুলেছে, এই তো! এতেই কি আমাদের জাত্ গিয়েছে ?"

বৃদ্ধ ক্রন্দন-বেগ সংবরণ করিলেন, দুই হাতে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"দেখ, তুমি যা ব'ল্লে যথার্থ ; কিন্তু সমাজ বোঝে কৈ ?"

"তুমি আর সমাজ সমাজ ক'রো না। যে সমাজ এ টুকু বোঝে না, সে সমাজ গোল্লায় যাক্—সে সমাজের মুখে ছাই। যে সমাজে কত কুল-কামিনী লুকিয়ে-ছাপিয়ে কত কুকাজ ক'রে পার পেয়ে যাচ্চে—কত জীবহত্যা—খুন-খারাবি হ'চ্চে, সমাজ তা দেখেও দেখে না—নিবারণের উপায় করে না ; কিন্তু ছল-ছুতোয় ভাল লোকের সর্ব্বনাশ করে—রুই-কাতলা ফস্কে পালায়, চুনো-পুঁটিকে নিয়ে টানাটানি করে, সে কি আবার সমাজ ? বিচার-বিবেচনা যেখেনে নেই, কে তারে সমাজ বলে ? এমন পাপের ভরা সমাজে জন্ম নিয়েও মহাপাপ হ'য়েচে।"

ব্রাহ্মণী আবেগভরে ক্রোধের বশে এই কর্কশ অথচ

খেদপূর্ণ কথা বলিয়া নীরব হইলেন। তখন মিশ্র ঠাকুর বলিলেন,—"দেখ, তোমার কথা এক বর্ণও মিথ্যে নয়, কিন্তু তাই ব'লে সমাজের গণ্ডীর বাইরে তো যেতে পারিনে ?"

"ছার সে গণ্ডী—ধিক্ সে গণ্ডীরে ! সে গণ্ডীর ভেতরে আর থাক্‌তেও চাইনে। এই তো তিন কাল গিয়েছে,—এক কাল আছে, কোন্ দিন টুপ ক'রে মরে যেতে হবে, গণ্ডী-ফণ্ডী কোন্ চুলোয় প'ড়ে থাক্‌বে। কাজ কি আর দু' দিনের জন্যে আমাদের সে গণ্ডীতে ?"

"তার পর ? চারিদিকে তাকিয়ে বুঝে-সুঝে ব'লো ব্রাহ্মণি ?"

"এর আর বোঝা-সোঝা কি ? আমাদের চলা-ফেরার কথা ? তার জন্যে ভেব না, ভগবান এক রকমে চালিয়ে দেবেন-ই। বিধেতার রাজ্যে কেউ কি না খেয়ে থাকে ? না হয় এই ভিটেটুকু আর বেহ্মত্তর বেচে শেষে কাশীতে গিয়ে থাক্‌ব—মা অন্নপূর্ণার কৃপায় সেখেনে অন্নের অভাব হবে না !"

বৃদ্ধ ইহা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আরে আমি যা বল্‌চি, তুমি যে তার কাছ দিয়েই যাচ্চ না, কেবল আবল-তাবল ব'কৃচ।"

"আচ্ছা কি বল, শুনি।"

"বলি তোমার লীলার—তোমার স্নেহের মেয়ের উপায় কি হবে ?"

"তুমি কি ভেবেচ মেয়ের উপায় হবে না ? আমাদের অবিদ্যমানে সে টোকা-পানার মত ভেসে বেড়াবে ? তা নয়—নীলীর আমার উপায় হবেই হবে।"

"কিরূপে হবে ? পাত্র কোথায় পাব ? গ্রামের লোকে যে কলঙ্ক রটিয়েছে, তাতে তো পাত্র পাওয়ার উপায় নেই ? সপ্তগ্রামের সম্বন্ধটা সেই কারণেই ভেঙ্গে গেছে। হায়, ঈশ্বর বৃদ্ধকালে কি বিপদেই ফেল্‌লেন। একটা মেয়ে নিয়ে এত লাঞ্ছনা! এ মেয়ে না জন্মালেও যে ভাল ছিল।"

ইহা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের দুই চক্ষু আবার অশ্রুপূর্ণ হইল, আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী আস্তে আস্তে বলিলেন,—"ভেবনা, ভাল পাত্রই মিল্‌বে।"

"তোমার এ দৃঢ়তার মানে আমি কিছু বুঝতে পাচ্চিনে ব্রাহ্মণি! তুমি বার-বারই ব'ল্‌চ, পাত্র পাওয়া যাবে—পাত্র মিলবে। আরে পাত্র কি আবার আকাশ ফুঁড়ে আস্‌বে ?"

মিশ্র ঠাকুর রুক্ষকণ্ঠে ইহা বলিয়া স্তব্ধভাব ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণীও স্তব্ধ, স্থানটী যেন নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল। ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিতেছেন,—"স্ত্রী-বুদ্ধি আর কত টুকু! বিশেষ আবার বৃদ্ধকাল! তাতে বর্ত্তমান ঘটনায় মনের গতি ভাল নেই, সুতরাং তার কথা তো অর্থ-হীন হইবে-ই! আমিই যখন ভেবে-চিন্তে সময়ে সময়ে দিশেহারা হচ্চি, তখন সে রমণী,—না হইবে কেন ?"

এদিকে মিশ্র-ঠাকুরুণের মনে তুমুল তুফান বহিয়া যাইতেছে। তিনি অন্তরের কি-একটা কথা মুখের আগায় আনিয়া বলি-বলি করিয়া আর বলিতে পারিতেছেন না;—কে যেন তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে। কি করিয়াই বা বলেন! যে সমাজে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সমাজ-বিধি পালন করিয়া আসিয়া এখন জীবনের সীমান্ত রেখায় দাঁড়াইয়াছেন, সেই সমাজ ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে

কোন-কিছু ভাবা অতি সহজ, কিন্তু মুখে ব্যক্ত করাটা বড় সহজ নহে। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাই অতি সঙ্কুচিতা—মহা চিন্তিতা হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ব্যক্ত না করিলেই বা উপায় কোথায়? তিনি অনেক ভাবিয়াছেন—অনেক চিন্তা করিয়াছেন,—নীরব নিশীথে অনেক কাঁদিয়া বুঝিয়াছেন,—সমাজের কাছে তাঁহার আর আশা নাই। বুঝিয়াছেন,—সমাজ নির্দ্দয়, সমাজ অত্যাচারী, সমাজে বিচার নাই; সমাজ খুঁটী-নাটী ধঁরিয়া সামাজিকতা ফলায়, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ পাপের প্রশ্রয়দাতা সমাজ। তাই তিনি সমাজের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়াই বলিয়াছেন,—সমাজ-গণ্ডীর ভিতরেও থাকিতে চাই না! তাঁহার স্বামী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ—সুশিক্ষিত, কিন্তু পত্নীর কথার মর্ম্ম তলাইয়া বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে বৃদ্ধা সমাজের মস্তকে কুঠার হানিয়া, লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া, মান-মর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়া স্বামীকে প্রাণের কথা খোলসা করিয়া বলিতে হৃদয় দৃঢ় করিলেন।

ব্রাহ্মণী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"বিধেতার খেলা! কারে দিয়ে যে কি উপকার হয়, বলা যায় না। নইলে সে দিন তো কতই লোক ছিল, কেউ তো সাহস ক'রে জলে ঝাঁপ দিতে পারেনি! সেই বিদেশীছেলেটী যেই ছিল—ছেলেটীর নাম কি?"

"মোস্তফা।"

"মোস্তফা যেই ছিল—বিধেতা তারে যেন যুগিয়ে এনে রেখেছিলেন,—তেই তো আমার নীলি বাঁচ্‌ল! বল দেখি, ছেলেটী কেমন? আহা কি তার সাহস!"

"ছেলেটী ? ছেলেটীর তুলনা নেই ! যেমন রূপ, গুণও বিধেতা তেমনি দিয়েছেন। তার হৃদয়-ভাব অতি উচ্চ ! আহা, কি তার নম্রতা—কি তার ভব্যতা ! কি তার মুখের মধুর বাণী ! অনেক বামুনের ছেলেরও আমি এমন সৌজন্য দেখি-নি। মোস্তফার প্রতি আমার বড়ই স্নেহ হ'য়েছে।"

ব্রাহ্মণী এইবার আপনার প্রাণের কথা বলিতে সুবিধা পাইলেন।—বলিলেন,—"ব'ল্‌ব কি, আমারো ছেলেটীর ওপর বড়ই মমতা হ'য়েছে—যেন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে ইচ্ছে করে ; আহা এমন সুবোধ ছেলে আর দেখ্‌ব না। তা আমাদের এই স্নেহ-মমতা যাতে চিরকাল থাকে, তাই ক'রলে কি হয় না ?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"সে কি প্রকার ?"

"দেখ, শত্রুরা যে বদনাম রটিয়েছে, তাতে সমাজে নীলির বিয়ে হওয়া কঠিন,—তা তুমি যে দেশেই যাও, পাত্র পাওয়া যাবে না। তাই আমি অনেক ভেবে-চিন্তে যা ঠিক করিচি, তাই ব'ল্‌চি। আমার ইচ্ছে হয়, এই ছেলেটীর হাতেই নীলিকে আমার সমর্পণ করি—দুটীতে মানাবেও বেশ।"

ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন ! তাঁহার অন্তর কাঁপিল,—মস্তকে যেন শত বজ্রাঘাত হইল। তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া ত্রস্ততার সহিত বলিলেন,—"ব্রাহ্মণি—ব্রাহ্মণি ! ব'ল্‌লে কি—ব'ল্‌লে কি ? কি লজ্জার কথা—কি ঘৃণার কথা তোমার মুখে আজ শুনলাম ! তুমি কি বুদ্ধিহারা—পাগল হ'য়েছ, না তামাসা ক'রবার জন্যে আমারে এ বেদ-বিধি-বহির্ভূত কথা ব'লচ ? তামাসা ক'রেও তো এ বলা উচিত নয় ! এ যে জাত-পাতের কথা ! এ কথা

রাষ্ট হলেও যে সমূহ বিপদ!' লোকে গণপতি মিশ্রকে ধিক্কার দেবে—শরমে মুখ দেখাতে পারব না। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ কেন? কোন শূদ্রও তো মুসলমানকে মেয়ে দিতে পারে না। ছি-ছি ব্রাহ্মণি! আমার সর্ব্বাঙ্গে যে বজ্রানল জ্বালিয়ে দিলে? ঘৃণায় যে ম'রে গেলাম! হৃদয় রে, বিদীর্ণ হও!" বলিয়া একটী দীর্ঘ তপ্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ নীরব হইলেন, তাঁহার নয়নে দর-দর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

পতির এই বিষম অসন্তোষ ও অনিচ্ছা দেখিয়াও পত্নীর অন্তর কিন্তু দমিল না—সঙ্কুচিত হইল না। বরং দৃঢ়তার সহিত আবার ধীরে ধীরে বলিলেন,—"তামাসা নয়, সত্যি-সত্যিই ব'লচি। কেন, তোমারি তো শাস্ত্রের কথা! তুমিই তো ব'লেছ, জাত্-কাত্ ওটা কিছু নয়, জাত্ আমাদের ঘর-গড়া বাঁধন মাত্র। জাত্ মানা-মানির ভেতর ধর্ম্ম নেই! আরো ব'লেছ,—ধর্ম্মের কাছে জাত্ নেই। যার ভগবানে ভক্তি আছে,—নিষ্ঠা আছে, যে সচ্চরিত্র-সদাচারী, তা সে যে-কুলেই জন্মাক, সেই মানুষ, সেই ধার্ম্মিক, সেই ব্রাহ্মণ! এই গুণেই তো উচুঁতে উঠেছিলেন বিশ্বামিত্র,—বামুন হইছিলেন। আর সেই নীচ দস্যি বাল্মীকি মুনি হইছিলেন। তোমারি ধর্ম্মে তো ব'লেছে,—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।' যে লোক অভদ্র—ইতর, সে চণ্ডাল,—তার নিন্দে সব ঠাঁই; তার ছায়াও মাড়াতে নেই। কিন্তু যে সভ্য-ভব্য, সদাচারী, তা সে যে জাতই হোক্, সে মাথার মণি—সে ভক্তির পাত্র! তার সাথে আচার-ব্যভারে দোষ কি? ভালর সাথে ভাল মিশ্‌লে দোষ কি? ভালর সাথে তো কালো

মিশ্‌বে না? তবে কেন আজ অন্য কথা ব'ল্‌চ? তবে কেন এমন সুশীল সুন্দর ছেলেটীকে মুসলমান ব'লে, ঘেন্নায় ম'বে গেলাম—মুখ দেখাতে পারবো না, ব'ল্‌চ? আমি তোমার কাছে যে ধর্ম্ম-কথা শুনেছি, সেই মতই ব'ল্‌চি;—অন্যায় কিছু ব'ল্‌চি কি?"

পত্নীর মুখে এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চক্ষু স্থির! কি যে উত্তর দিবেন আকাশ-পাতাল খুঁজিয়া পাইলেন না। কিছু-ক্ষণ গম্ হইয়া থাকিয়া বলিলেন,—"দেখ জাত্ বা সমাজ ঘর-গড়া বাঁধন সত্য! কিন্তু সে বাঁধন কাট্‌তে পারে, কার সাধ্য? এই যে তোমার ঘর-খানা তৈরী করা হ'য়েছে, এ কি ভাঙ্গ্‌তে পারা যায়? বল দেখি?"

"কেন যাবে না? দরকার হ'লে ভাঙতেই হবে। দরকার হ'য়েছে ব'লেই তো জাতের বাঁধন কাট্‌ব মনে ক'রেছি; নইলে আমার হৃদয়ের ধন নীলির কি উপায় হবে বল দেখি? আমা-দের অবিদ্দিমানে সে কোথায় দাঁড়াবে—কে তার মুখ পানে চাইবে? সে কি চির-আইবুড় থেকে পাঁচ দুয়োরে ঝাঁট দিয়ে বেড়াবে—হাড়ী-মুচীর ভাত খাবে?" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণী আহ্ উহ্ করিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মিশ্র ঠাকুর অবাক্! তিনি হতবুদ্ধি হইয়া নীরবে এক দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিছু ক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী আবার ধীরে ধীরে বলিলেন,—"তুমি যাই বল না কেন, নীলি আমার যাতে সুখী হয়, তাই ক'রতে হবে! কিছু না ঘ'ট্‌তেই যখন এই নিন্দে—মিথ্যে কলঙ্ক, তখন

আর কিসের ভয় ? সমাজ ?—ব'লেছি তো সমাজ চাইনে—সমাজের গণ্ডীতে আর থাক্‌ব না। মোস্তফার হাতেই নীলিকে সমর্পণ ক'রব। আজ যদি কোন রাজার ছেলে বর হ'য়ে এখানে আসে, তবুও সে বিয়ে হবে না,—বিধেতার ইচ্ছেও তা নয়! মোস্তফার হাতেই লীলাকে দেব—লীলা মোস্তফারই অনুরাগিণী।”

মিশ্র ঠাকুব শিহরিয়া উঠিলেন ; তাঁহার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল—প্রাণের ভিতর কি যেন একটা উদ্বেগ—কি যেন একটা অননুভূত ব্যথার ঝড় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ শুইয়া পড়িলেন—বিষম বিরক্তির সহিত বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে বলিলেন,—“এঁ্যা—এঁ্যা! এত দূর—এত দুর! এত দুর অবৈধ আচরণ! তার এমন মতি-গতি হ'য়েছে। এ তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! উঃ আমার জাত-কুল, মান-সম্ভ্রম, ধর্ম্ম কি আর আছে? ধিক্ আমাকে! হায়! মন্দভাগিনী ডুবে ম'রলেও যে ভাল ছিল!”

কন্যাগতপ্রাণা মিশ্র-পত্নী “ডুবে ম'রলেও যে ভাল ছিল,” কথাটী শুনিয়া প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন—রোষ-ভরে বলিলেন,—“সে ডুবে ম'রবে! কেন? তার অপরাধ? চোদ্দ বচ্ছর বয়েস হ'ল, তার বিয়ে দিতে পারলে না,—সে যেই মেয়ে, তেই চুপ ক'রে থাকে।” এই কথা বলিয়া কাতরকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“তার মনে যে কি কষ্ট, তা সেই জানে! আহা বাছার আমার মলিন মুখ খানা দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়; তুমি পুরুষ মানুষ, সে ব্যথা কি বুঝবে? তা আর বোঝা-বুঝিতে কাজ নেই, সে চুলোয় যাক্—হাড়ী-মুচীর ভাত খাক্‌গে! এই থাক্‌লো

তোমার সিষ্টি-সংসার, আমি চ'ল্‌লাম—আমিই ডুবে ম'রে এ যন্ত্রণা এড়াই—আমার হাড় জুড়ুক।"

ইহা বলিয়া বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে নীচে নামিলেন। মিশ্র ঠাকুর দেখিলেন,—এ আবার কি বিপদ! বিপদের উপর বিপদ! তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিলেন,—শান্ত প্রকৃতির লোকের ক্রোধ হইলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না—হঠাৎ কুকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে। ব্রাহ্মণী অভিমানের ভরে যদি জলেই ঝাঁপ দেয়, তবেই তো আমার সর্ব্বনাশ! তাই তাড়াতাড়ি নামিয়া পত্নীর সম্মুখে গিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণি! কর কি! কর কি! যাও কোথা?"

"চুলোয় যাচ্চি—যমের বাড়ী যাচ্চি! তুমি সরো—রাস্তা ছাড়। আমি না ম'লে এ আগুন আর নিব্‌বে না—আমার হাড় জুড়াবে না। সরো—যেতে দাও।" বলিয়া মিশ্র-পত্নী পাশ কাটিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মিশ্র ঠাকুর—"তুমি বুদ্ধিমতী হ'য়ে আজ এ কি নির্বুদ্ধিতা! ফেরো—তোমার মত রমণীর এত রাগ কি সাজে? আত্মহত্যা—মহাপাপের কথা তোমার মুখে! এস, পরামর্শ ক'রে যাতে ভাল হয়, তাই করা যাবে," নম্রভাবে এই কথা বলিয়া পত্নীর হাত ধরিয়া দাওয়ায় আনিয়া বসাইলেন। উভয়েই নীরব! বৃদ্ধ মিশ্র ঠাকুর মনে মনে বলিলেন,—"মোস্তফা উপযুক্ত পাত্র বটে, কিন্তু—মন সরে না—মুসলমান! মুসলমানকে কন্যা দিলে জাতিভ্রষ্ট হ'তে হবে,—রাজ্যের কলঙ্ক মাথায় চাপ্‌বে। কিন্তু এখন উপায় কি? হিন্দুর কাছে তো আর আশা নেই? হিন্দুর ভেতরও কিন্তু এমন সৎপাত্র মেলে না! এ

পাত্রে যখন সবাই রাজি, তখন আমি আর আপত্তি ক'রে অনর্থ ঘটাই কেন? যা আমার ভাগ্যে আছে, তাই হবে। না হয়, কন্যা দান ক'রে ত্রিবেণী ত্যাগ ক'রে যাব—কাশী-বাসী হব। সেই-ই ঠিক।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"ব্রাহ্মণি! আমার এখন কি ক'রতে হবে বল।"

ব্রাহ্মণী নীরব—তাঁহার অভিমান-বেগ এখনও থামে নাই। ব্রাহ্মণ আবার করুণ কথা বলিলেন, তখন তাঁহার মান-ভঞ্জন হইল। তখন ব্রাহ্মণী বুঝিলেন,—ব্রাহ্মণ এত ক্ষণে পথে আসিয়াছেন। তাই ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"যাতে ভাল হয়, তাই করো।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"এর জন্যে আমাকে কি মোস্তফার কাছে যেতে বল?"

"না,—তা বলিনে" বলিয়া ব্রাহ্মণী চুপ করিলে মিশ্র ঠাকুর বলিলেন,—"না গিয়ে মনে মনে থাক্‌লে কি কোন কাজ হয়?"

"হয় না জানি, কিন্তু পত্র লিখে যে সিষ্টি-সংসারের কারবার চলে! একখান পত্র লিখে আমাদের মনের কথা পাড়তে হবে,—বুঝেছ?"

বৃদ্ধের মাথা আবার ঘোলাইয়া উঠিল। ভাবিলেন,—এক জন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ ভিন্ন-ধর্ম্মী মুসলমানকে সহসা এ কথা কেমন করিয়া লিখিব? ছি ছি, এ কি অত্যাচার! আমি তাহা কিছুতেই পারিব না। দম খাইয়া খানিক পরে বলিলেন,—"সে পত্রখানা আমার লেখা উচিত কিনা, বল দেখি?"

ব্রাহ্মণী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা নীলিও তো একটু-আধটু লিখতে-প'ড়তে জানে! বামাকে ব'লে না হয়,

তারে দিয়েই পত্র খানা লেখাব খুনি ! উত্তর এলে অবস্থা-মত ব্যবস্থা ক'রো ।”

“সে কি লিখ্‌তে পারবে ?”

“পারবে ব'লে তো জানি ! তাব হাতের লেখা তুমিও তো দেখেছ ।”

“দেখেছি, কিন্তু পত্র লিখ্‌তে পারবে ব'লে বিশ্বাস হয় না ; তার তত খানি শক্তি এখনো হয়নি ।”

“তা যদি নাই-ই হয়, তবে তোমার লিখতে হানি কি আছে ?”

“হানি যা ছিল, তা আর এখন নেই ; কিন্তু—চক্ষু-লজ্জা—”

মিশ্র ঠাকুর আরো কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণী সেই কথার উপরে রোষভবে বলিলেন,—“চক্ষু-লজ্জা !—যখন মেয়ে সম্প্রদান ক'রতে হবে, তখন চক্ষু-লজ্জা কোথায় থাক্‌বে ?”

ব্রাহ্মণ চুপ। কিছু ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—“দেখ ব্রাহ্মণি, গণ্ডী-ছাড়া কাজ ক'রতে গেলেই প্রথম প্রথম চক্ষু-লজ্জা হয়, কিন্তু সে লজ্জা ভেঙ্গে গেলে তেমন বাধা আর ঠ্যাকে না। তা তখন সম্প্রদান কেন ? তখন জামাইকে আলিঙ্গন দিয়ে আদর ক'রে ঘরে বসাতেও কুণ্ঠা হবে না ।”

ব্রাহ্মণী বুঝিলেন,—কথাটা ঠিক, কিন্তু উপায় কৈ ? নীলি কি তলিয়ে গুছিয়ে মনের কথা লিখতে পারবে না ? পারবে—যা পারবে, তাতেই হবে। কিন্তু যদি না পারে, তখন্ ?—তখন কি হবে ? ব্রাহ্মণী নীরবে চিন্তার পাথারে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইতে লাগিলেন। শেষে তাঁহার মনে হইল, বদ্দিদের মেজো বৌর কথা।

অমনি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"বদ্দিদের মেজো বৌ লেকা-পড়ায় খুব পাকা; সে তার দেওরদের পত্র লেখে—বেণেদের বাড়ী পত্তর-টত্তর এলে সেই পড়ে। তারে দিয়েই লিখিয়ে নিলেই হবে।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"তারে দিয়ে লিখিয়ে আবার হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্‌বে? রাষ্ট্র হ'লে বেল্লিক বেটারা হৈ-চৈ ক'রে আবার আর একটা গোল পাকাবে।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"না, রাষ্ট্র হবে না, সে খুব চাপা মেয়ে মানুষ! আমারে খুব ভক্তি করে—মা-ঠাকরুণ ব'লে অজ্ঞান। আমি তারে যা ব'ল্‌ব, সে তাই শুন্‌বে, কখ্‌খোনো রাষ্ট্র ক'রবে না। তবে নীলি যদি লিখতে পারে, তা হ'লে আর তারে ডাকবার দরকার হবে না।"

"আচ্ছা সেই ভাল, এখন তবে একটু ঘুমোও, আমারো ঘুম পাচ্চে।" ইহা বলিয়া মিশ্র ঠাকুর নিজ শয্যায় গমন করিলেন; কিন্তু তাঁহার আর নিদ্রা আসিল না, শয্যায় পড়িয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে মিশ্র-পত্নীও এই দশাপন্না; উভয়েই গড়াগড়ি পাড়িয়া চিন্তা-দেবীর সেবা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পত্র-লিখনে

নারী-হৃদয় স্নেহ-মমতার কোমল উপকরণে গড়া; সে হৃদয়ে কঠোরত্ব নাই বলিলেই হয়। সে হৃদয় মধুর, কমনীয়, অমিয়-ভরা। থাকুক নিজের সহস্র জ্বালা-যন্ত্রণা, আত্মজনের তো কথাই নাই,—পরের কষ্ট দেখিলেও সে হৃদয় গলিয়া যায়—লতাইয়া পড়ে, বিষম বেদনা বোধ করে,—পরদুঃখ-কাতরতায় সে হৃদয় আকুল ও উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

মিশ্র ঠাকুর ও তৎপত্নীর নিশীথ নির্জ্জনে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহার কতকাংশ লীলাবতীর কাণে পৌঁছিয়াছিল, বামাও শুনিয়াছিল। তখন তাহারা উভয়েই জাগরিত ছিল। লীলাবতী শুইয়া শুইয়া শুনিল,—বামা দুয়ারের কাছে আড়ালে বসিয়া কাণ খাড়া করিয়া শুনিল। কথা শেষ হইলে সে লীলাবতীর কাছে গিয়া গা টিপিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"সই, শুন্‌চো, কাল তোমাকে এক জনকে পত্তর লিক্‌তে হবে।"

লীলাবতী সে কথার উত্তর করিল না; তখন তাহার অন্তরে ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। সে তাহার পিতা-মাতার প্রথমকার অস্ফুট কথা ততটা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু শেষের কথাগুলি সমস্তই শুনিয়াছিল। শুনিয়া বুঝিয়াছিল,—তাহার পিতা-মাতার কষ্ট কি অসহনীয়! কি হৃদয়-বিদারক! লোকে যে জন্তে তাহার কলঙ্ক রটাইয়াছে—মন্দ তাহাতে তাহার নিজের তত

ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, সে কলঙ্ক-পসরা মাথায় লইতে সে গৌরব মনে করে। কিন্তু পিতা-মাতার দারুণ মনস্তাপ দেখিয়া লীলাবতী বড়ই ব্যথিত হইল। তাহার জন্যই তো তাঁহাদের যত মনস্তাপ, অপবাদ, আপদ-বিপদ, দুশ্চিন্তা! বালিকার আয়ত চক্ষু দুটী অশ্রুতে ভাসিয়া গেল, অন্তর দারুণ ক্লেশে আচ্ছন্ন হইল। বালিকা অনেক ভাবিল,--ভাবিয়া ভাবিয়া হতজ্ঞান হইল।—তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। যে ঘোর অনল-যাতনা তাহার হৃদয়ে দিবা-নিশি ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে, তাহাব উপরে এ আবার কি জ্বালা! মনে মনে বলিল,—“ডুবিয়াছিলাম তো মরিলাম না কেন? যে প্রেমময় মুখখানি দেখিয়া মা-গঙ্গায় জলসই হইয়াছিলাম, সেই মধুমাখা মুখের মধুময় স্মৃতিটুকু লইয়া এ প্রাণ বাহির হইলেই তো ভাল ছিল! তাহা হইলে তো বৃদ্ধ বাপ-মার এ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ঘটিত না! সব গোল চুকিয়া যাইত!”

এইটুকু ভাবিতেই দপ্ করিয়া বালিকার মনে জলে ডোবার দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল! সে যেন জাগ্রৎ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। অন্তশ্চক্ষে দেখিল,—সে যেন তাহার প্রাণারামের বুকে রহিয়াছে! ঐ যেন সে সাঁতার কাটিতেছে! ঐ যেন সে তাহার বুকে নিজের নধর ললিত বুকখানি রাখিয়া নীরবে সটান শুইয়া আছে—এক একটা তরঙ্গ উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আহা কি সে সুখময় স্বপ্ন! লীলাবতীর অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

আত্ম-হারা লীলাবতী নিদ্রিত-জাগ্রতে নিয়তই এ স্বপ্ন দেখে—এ স্বপ্নে বিভোর থাকে। এ স্বপ্ন তাহার আর ফুরায় না—এ স্বপ্নের অন্ত হয় না! বাসনা,—আবার সে ডোবে, আবার সেই

সুকোমল বক্ষে শয়ন করে,—আবার ডোবে, আবার শয়ন করে! আহা এইরূপ শত বার ডুবিলেও বুঝি তাহার আকাঙ্ক্ষা মেটে না—তৃপ্তি জন্মে না! তার অফুরন্ত এ কামনা! বাসনা অনন্ত—অতৃপ্ত—অপার!!

লীলাবতীর নৈরাশ্যের মধ্যে আবার আশার বিদ্যুৎ চমকাইল। আবার ভাবিল,—না—না—না, এই অনন্ত কামনা, এই অফুরন্ত বাসনা—হৃদয়ের এই দগ্ধ ক্ষত লইয়া কি আমি মরিতে পারি? প্রাণের জ্বালা না জুড়াইলে কি দেহের মায়া ছাড়িতে পারি? কখনই না। বিধাতার ইচ্ছাও তাহা নহে। আহা মা আমার কত মনস্তাপ পাইয়াও আমার সুখ-সোয়াস্তির জন্য ব্যাকুল! আমার জন্য মরিতেও প্রস্তুত! 'মা-গো মা——'বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া লীলাবতী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বালিশে মুখ লুকাইল।

এদিকে রজনী-দেবী আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিবেন না বলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পক্ষী ডাকিল, দুই একটী নর কণ্ঠও শ্রুত হইতে লাগিল। বামা শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিল,—তাহার সই উপুড় হইয়া বালিশে মুখ দিয়া আছে। ভাবিল, ঘুমাইতেছে। "সই আমার ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে প্রাণে সোয়াস্তি পেয়েছে,—ঘুমুচ্চে!—আহা ঘুমুক! ভাবনায় রাত জেগে-জেগে ওর দেহে আর দেহ নেই, ঘুমুক!" মনে মনে ইহা বলিয়া বামা ঘর হইতে নামিয়া গেল। বামার প্রত্যুষে উঠার অভ্যাস ছিল, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীও প্রত্যুষে উঠিতেন। কিন্তু আজ তাঁহারা শয্যা ত্যাগ করেন নাই। বামা রাত্রির ঘটনা মনে করিয়া

সেদিকে আর লক্ষ্য করিল না—গৃহস্থালীর কাজে মন দিল। পরে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীও উঠিয়া স্নানাহ্নিক সারিলেন। ক্রমে বেলা বাড়িয়া চলিল। যথাকালে মিশ্র-পরিবারের খাওয়া-দাওয়ার কাজ সাঙ্গ হইল। দুর্ভাবনায় কেহ কম খাইল—কি কেহ খাইতে পারিল না, সে কথা আমরা বলিতে চাহি না।

মিশ্র-পত্নী আহারান্তে কন্যাকে কাছে ডাকিয়া স্নেহভরে আস্তে আস্তে বলিলেন,—"মা নীলি, একটা কথা বলি শোন্, তোকে একখান পত্তর লিখতে হবে, কোথায় লিখতে হবে, কি লিখতে হবে, তা বামার কাছে শুন্‌তে পাবি খুনি।"

লীলাবতী নীরব—লজ্জায় মুখ নত করিল, কেননা কাহাকে পত্র লিখিতে হইবে, সে তাহা জানে,—মাতৃ-মুখে রাত্রির কথা-বার্ত্তায় সে তাহা টের পাইয়াছিল। তাই তাহার লজ্জা হইল, চোখে-মুখে লজ্জা, কিন্তু অন্তরে লজ্জা নাই।—অন্তর আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল—বুক দুরু দুরু করিল। বালিকা মুখ নীচু করিয়া নিজ কক্ষে গিয়া তখ্‌ত্‌পোষের উপর বসিল। পরক্ষণে বামা মিশ্র-ঠাকুরের ঘর হইতে লিখিবার উপকরণ—দোয়াত, কলম, কাগজ লইয়া হাজির;—কাগজাদি সামনে রাখিয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—"দেখ্‌লে সই, যা ব'লেছিলাম, তাই তো হ'ল। তা আমি আর ব'লব কি, পোয়াতিকে প্রসবের ব্যথা কি জানাতে হয়? তোমার মনের কথা তুমি নেকো।"

লীলাবতী নানা ওজর করিয়া সকাতরে বলিল,—"সই, এ কাজ আমার নয়। আমি কোন্ কালে কারে পত্তর লিখেছি,—তাই আজ লিখ্‌ব! আমি লিখ্‌তে পারব না।"

বামা রুষ্ট-মিষ্ট-ভাবে বলিল,—"পারবে না? তা হ'লে সব মাটী ক'রবে? নেকো—আমি রান্না-ঘরের কাজ সেরে আসচি, নেকো।"

বামা ঘর হইতে চলিয়া গিয়া নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইল; লীলাবতী কাগজ-কলম লইয়া বসিল। কিন্তু লিখিবে কি? লিখিতেই বা সে কি জানে? পত্র-লেখার অভ্যাস তো তাহার নাই! বালিকা অনন্যমনে বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—মুহূর্ত্তে শত শত ভাব তাহার অন্তর অধিকার করিল। কত আশা, কত অনুরাগের অমিয়া-ধারা তাহার প্রাণ-মন ভাসাইয়া ঢেউ খেলিতে লাগিল। কিন্তু কি লিখিবে? বালিকা আত্ম-হারা, ভাবে বিভোর, নীরব—নিষ্পন্দ! আকাশ-পাতাল হাঁতড়াইয়া কি লিখিবে স্থির করিতে পারিল না, লিখিবার কথা খুঁজিয়া পাইল না। একবার বালিশের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কাগজের উপর লেখনী ধারণ করিল, কিন্তু লেখা হইল না—লেখার কথা লেখনীর মুখে ফুটিল না। বুক দুরু দুরু করিল, হাতও কাঁপিয়া গেল। "মা ব'লেছেন যা লিখতে হবে, সইএর কাছে সব শুন্‌তে পাবে। কৈ, সই তো তেমন কিছু ব'ললে না? তবে সই আসুক।" মনে মনে ইহা বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বালিকা লেখনী ত্যাগ করিল।

ইহার কিছুক্ষণ পরে বামা মনের খুশীতে হেলিতে দুলিতে ঘরে প্রবেশ করিল। বামার মুখে আজ আর হাসি ধরিতেছে না। বামা আসিয়া দেখিল,—লীলাবতী সম্মুখে একখানি পুঁথির উপরে কাগজ আর পাশে দোয়াত-কলম রাখিয়া চুপটী করিয়া

বসিয়া আছে। বামা ঘরে গিয়াই মুচকি হাসিয়া বলিল,—"সই, চুপটী ক'রে ব'সে কোন্ দেবতার ধ্যানে বিভোর হ'য়েছ ?"

"সই, তোমার কথাই ভাবচি।" বলিয়া লীলাবতী ফুল্ল মুখে বামার মুখের দিকে চাহিল। বামা লীলাবতীর পাশে বসিয়া আরো একটু ব্যঙ্গ জুড়িয়া দিল। বলিল,—"আমার কথা ভাব্চ ? এটা তোমার মিথ্যে কথা ; যার জন্যে দিন নাই, রাত নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, সদাই আকুল—জ্ঞান-হারা, যার জন্যে মুখে হা-হুতাশ, প্রাণ উদাস, ভেবে ভেবে সোণার বর্ণ কালী—এই চাঁদপানা মুখ-খানা শুকিয়ে ছোট্ট হ'য়ে গিয়েচে, তারে ফেলে আমার ভাবনা ? যারে ভাবলেও সুখ আছে, সোয়াস্তি আছে, প্রাণে আরাম আছে, সেই তোমার মনোচোর—সেই তোমার হৃদয়-দেবতারে থুয়ে আমার ভাবনা ? এ তো হ'তে পারে না দিদি ?"

লীলাবতী হাসিল। বহু দিন পরে লীলার বিষাদ-ভরা মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল ; যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইল। সইএর ব্যথায় ব্যথিতা রসবতী বামার মনে তাহা দেখিয়া বড় আহ্লাদ হইল।

লীলাবতী বলিল,—"সই, তা আর ব'লে কষ্ট পাচ্চ কেন ? চুম্বকের টানে লোহা না ছুটে কি থাক্‌তে পারে ? পিয়াস না মিট্‌লে চাতকী মেঘের পানে চেয়ে 'দে-জল দে-জল' না ব'লে কি চুপ্ থাক্‌তে পারে ? কখনই না। তাই ব'লে যে, আমি তোমার কথা ভাবচিনে, তাও নয়। গোড়া না ধ'রলে কি আগা ধরা যায় ? তা ও-কথা যাক্, বলি শোন, লিখতে গেলে

যে আমার হাত কাঁপছে ! আর কি যে লিখব, তাও তো আকাশ-পাতাল ভেবে কিছুই ঠিক ক'রতে পাচ্চিনে !

"ওমা ! তুমি বুঝি কিছুই নিকুনি ?" বলিয়া বামা দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী কপোলে ঠেকাইয়া অবাক্ হইয়া রহিল। মনে মনে বলিল,—'না জানি আরো কতই হবে !' প্রকাশ্যে বলিল,—"এর আর ঠিক-ঠাক কি ? পেটে ক্ষিধে থাক্‌লে কেউ কি খাও খাও ব'লে সেধে খাওয়ায়, না যার ক্ষিধে লাগে, সে নিজে চেয়ে নিয়ে খায় ?"

লীলাবতী বিরসমুখে বলিল,—"সই, সব-ই বুঝি, কিন্তু বুঝেও যে অবুঝ হয়ে প'ড়েছি সই ! কি যে লিখ্‌ব, তার খেঁই পাচ্চিনে। মা কি ব'লেচেন, বল দিকিন ?"

"মা ব'লেচেন, তোমার মনের ভাব কি, তুমি কি চাও, তাই নিকুতে। কেন তুমি তারে প্রাণ ভ'রে ভালবেসেছ—তার জন্যে পাগলিনী, কেন গঙ্গায় ডুবেছিলে, তাই নেকো। সব কথা বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে তার পরে গুচিয়ে নেকো।"

লীলাবতী ইহা শুনিয়া কিছু ক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিল, পরে কলম লইয়া বালিশে ভর দিয়া লিখিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কি জ্বালা, আবার বুক দুরু দুরু,—আবার হাত কাঁপিল। বালিকা স-কলম হাত তুলিয়া বলিল,—"সই, এই দেখ—এই দেখ, আমার হাত কাঁপচে—বুক ধ্বক ধ্বক ক'রচে। কেন এমন হ'চ্চে সই ?"

"ও কিছু নয়। পেরতম পেরতম মনের মানুষকে প্রাণের কথা ব'ল্‌তে কি নিকৃতে গেলে অমন হ'য়ে থাকে। বেণেদের মেয়ে মল্লিকে পেরতম বরের কাছে গিয়ে ভয়ে মূচ্ছ গিইছিল,

তা কি শোননি? কিন্তু তুমি তো তার পরশ পেয়েছ সই! তোমার অমনটী হ'লে চ'লবে কেন? তুমি দুগ্‌গা ব'লে মন ঠিক ক'রে নেকো। আমি তত ক্ষণ পুকুর থেকে বাসনগুনো মেজে-ঘ'ষে আনি।"

বামা ইহা বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিল। আসিবার সময় হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আমি যদি সই নেকা-পড়া জানতাম, তা হ'লে ফড়-ফড় ক'রে নিকে ফেল্‌তাম। যে আমার প্রাণের প্রাণ, প্রেমের অধিকারী, যৈবনের কাণ্ডারী, তারে প্রাণের কথা নিকুব, তার আবার ভাবনা!"

লীলাবতী কথা কহিল না,—একটীবার অপাঙ্গে বামার দিকে চাহিয়া হাসিল—হাসিয়া কাগজ-কলম ধরিল; মনে মনে কত দেব-দেবীকে ডাকিয়া চিত্ত স্থির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে প্রাণের আবেগে প্রাণেশ্বর, হৃদয়-বল্লভ, মনোচোর, প্রিয়তম প্রভৃতি কতই প্রেমপূর্ণ কথা তাহার মনে আসিল, কিন্তু পত্রে সব লিখিতে পারিল না, কত কষ্টে—মাথাটী কখন বামে, কখন ডাহিনে কাৎ করিয়া, কখন সোজা করিয়া, কখন বা বালিসের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উহার দুই একটী শব্দ লিখিয়া ফেলিল। এই কার্য্যটুকু সম্পন্ন করিতে তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল—তাহার বড়ই শ্রম হইল। বালিকা কাগজ-কলম ত্যাগ করিয়া বালিশের উপর চিৎ হইয়া একটী উহ্‌-হ্‌ শব্দোচ্চারণের সহিত আলস্য ছাড়িয়া শুইয়া পড়িল।

ভাদরের ভরা নদী—কাণায় কাণায় উচ্ছ্বাস-ভরা নদী দেখিয়াছ কি প্রিয় পাঠক? সে নদী কত চঞ্চলা, কত আবেগ-

ময়ী, কত প্রখরা! ঢেউ-এর উপর ঢেউ, তার উপরে ঢেউ, কেবল ঢেউ আর ঢেউ! ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে নদী তোলপাড়—কল্লোলময়ী। যদি দেখিয়া থাক, তবে পাঠক! লীলাবতীর হৃদয়-ভাব তোমাকে আর বুঝাইব না; লীলাবতী সেই অবস্থা-পন্না—লীলাবতীর অন্তর উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ। আর পাঠিকে! তুমি যদি কখনও এ দায়ে ঠেকিয়া থাক, তবে তোমাকেও তো আমার বলিবার কিছু নেই!!

কয়েক মিনিট পরে উঠিয়া লীলাবতী আবার লিখিতে বসিল। বালিশে ভর দিয়া অতি সাবধানে—অতি সন্তর্পণে মনের ভাব গোছাইয়া গোছাইয়া, বিনাইয়া বিনাইয়া লিখিতে সুরু করিল। কত ক্ষণের অক্লান্ত পরিশ্রমে গুটী চার-পাঁচ ছত্র লেখা হইল বটে, কিন্তু কি জ্বালা! কেবলি কাটা-কুটি, কেবলি কালীর দাগে কাগজখানি ভরিয়া গেল,—যত্ন সত্ত্বেও অক্ষরের ছাঁদ সুডৌল—সুন্দর—সমান আকারের হইল না, ছত্রও ট্যাড়া-ব্যাঁকা! আকাশে পা আর পাতালে গিয়া ছত্রের মাথা ঠেকিল। এ কি ঝক্‌মারি! এতক্ষণে এত করিয়া হইল এই লেখা!! এত কাটা-কুটি—এত কালীর দাগ! এ জঘন্য লেখা কি কোন ভদ্র লোকের হাতে দেওয়া যায়! প্রণয়ের প্রথম আলাপের পত্রের কি এই দশা! লজ্জায় যে মাথা কাটা যাইতেছে!—এ পত্র দেখিয়া ভাবিবেন কি! তাই বা সব কথা লেখা হইল কৈ? মাত্র চারিটী-পাঁচটী ছত্র! তার কাটা-কুটিগুলো বাদ দিলে তিনটী ছত্রও হইবে না। মনের কথা মনেই রহিল, লেখা হইল না; কত আশা-ভরসা-সাহসে বুক বাঁধিয়া লিখিতে বসা, কিন্তু

লেখা হইল না; লেখার সাধ্যও তো আর নাই! বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল। এই টুকু লিখিতেই তাহার কপালে, কপোলে, নাকে, ওষ্ঠোপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইল। শেষে চক্ষু মুছিয়া পত্রের নীচের দিকে নিজের নাম "দাসী লীলাবতী" লিখিল। তৎপরে মনে মনে বলিল,—"এই তো আমার লেখার শেষ! এতেই দয়া ক'রো হে বিধাতা!"—বলিয়া বালিকা দারুণ মনোবেদনায় সটান হইয়া শুইয়া পড়িল, মসী-চিত্রিত সাধের চিঠি খানি বক্ষোপরি রাখিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে বামা ঘরে আসিয়া বলিল,—"সই, পত্তর নেকা হ'য়েছে তো?"

লীলাবতী নিরুত্তর। বামা বালিকার বুকের উপর কালীর দাগ-পড়া কাগজখানি দেখিয়া সহর্ষে বলিল,—"বেশ বেশ; সোহাগের মধুমাখা পত্তর এমন দেবতার দুল্লভ ঠাঁই ছাড়া কি আর কোথাও থাকতে পারে?"

লীলাবতী বিরস-বদনে বলিল,—"সই, কথা ঠিক, কিন্তু পত্তর লেখা হ'ল কৈ?" বামা লীলাবতীর পাশে বসিয়া কাগজখানি টানিয়া লইয়া দেখিল। দেখিয়া বলিল,—"এই যে! এই তো নিকেচ?"

"ও কিছুই নয়, দেখ্‌ছ না, কেবল কাটা-কুটি আর কালী-পড়ার দাগ!"

বামা লীলাবতীর কথা বিশ্বাস করিল না, হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, এ আবার নাকি কিছু নয়! এত নেকা! তা' এখন তো সই লুকোচুরী খেলাই হবে।"

বালিকা কাতর-কণ্ঠে বলিল,—“সই, লুকোচুরী নয়, সত্যি বল্‌চি—তোমার দিব্বি, পত্তর লেখা হয় নি। পেটে কত কথা, বুক-ভরা কত আশা, কিন্তু লেখার মুখে সে সব কিছুই উঠ্‌ল না—কলমের মুখে ফুট্‌ল না। পোড়া হাত কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।”

বালিকা মৃদু কাতর-বাক্যে ইহা বলিতে বলিতে দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া ফেলিল, বামা তখন চিন্তা-বিজড়িত চক্ষু উপর দিকে তুলিয়া বলিল,—“এঁ্যা, লিক্‌তে পারলে না? আচ্ছা, যা লিকেচ, পড় দিকিন?”

“সই, প’ড়ব কি—ও কিছুই নয়। মন ঠিক ক’রে, দেবতাদের ডেকে কত চেষ্টা ক’রলাম, কিন্তু লেখা হ’ল না—আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ!”

বালিকার হতাশ চোখের করুণ চাহনী দেখিয়া বামা আর কিছু বলিল না;—বুঝিল, সত্যই পত্র লেখা হয় নাই। যে সাত জন্মে লেখে নাই, দুই একখানি পুঁথি পড়িলেই সে কি লিখিতে পারে! এখন উপায়? যাই তবে মা-ঠাকরুণকে বলিগে। বামা মনে মনে এই চিন্তা করিয়া বাহিরে আসিল এবং ব্রাহ্মণীকে অবস্থা জানাইল। ব্রাহ্মণী শুনিয়া দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু হতাশ হইলেন না। চুপে চুপে বামার কাণের কাছে কি কথা বলিয়া তাহাকে কোথায় পাঠাইয়া দিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটী শ্যামাঙ্গী আধা-বয়সী রমণী বামার সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণীর বয়স একটু বেশী হইলেও দেহ মাংসল, মুখ খানি সুন্দর, চোখ দুটী চঞ্চল ও জেল্লাদার;

ঠাট-ঠমকও বেশ আছে। যৌবনকালে সে যে অতি সুন্দরী—জন-মনোহরা ছিল, এ বয়সেও সে ধারা যথেষ্ট বিদ্যমান !

রমণীকে আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে নামিয়া বেড়াব কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"ডেকেচেন কেন মা-ঠাকরুণ ?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"মা, বিশেষ একটা দরকার—একটা উপকার ক'রতে হবে। তোমরা ভালবাসো,—ভক্তি-ছেদ্দা কর ব'লেই একটু কষ্ট দিচ্চি মা—একটা গোপনের কথা"--ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণী চুপে চুপে অনেক কথাই বলিলেন।

রমণী নীরবে শুনিয়া বলিল,—"এতে আর কষ্ট কি মা-ঠাকরুণ ? পাড়ার কত জনের পত্তর লিখে-পড়ে দিই, আর আপনাদের দেব না ?"

ব্রাহ্মণী এই সময়ে বলিলেন,—"কিন্তু মা, এ-কথা তুমি জান্‌লে আর আমরা জান্‌লাম। যেন কাগে-বগেও টের না পায়—রাষ্ট না হয়, এই আমার অনুরোধ। আমরা অতি কষ্টে প'ড়েই এ কাজ ক'রতে যাচ্চি।"

রমণী বলিল,—"এ কি বলবার কথা, মা-ঠাকরুণ ? তা হ'লে যে লোকে আমারেও মন্দ-ছোন্দ ব'লবে—ব'লবে তুইও এর ভেতর আছিস্।"

"তাই না হ'লেই হ'ল মা !" বলিয়া ব্রাহ্মণী রমণীকে লীলাবতীর কক্ষে লইয়া গেলেন।

বদ্দা-বৌকে দেখিয়া লীলাবতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল,—কাগজ খানি লুকাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না !

বদ্দী-বৌ ক্ষিপ্রহস্তে কাগজখানি লইয়া বলিল,—"এই যে—লেখা হ'য়েছে দেখ্ছি !"

লীলাবতী মুখ নত করিল। বামা বলিল,—"দিদি, ও কিছুই হয়নি, তুমি মার কাছে যা যা শুন্‌লে, সেই মত বেশ ক'রে লিকে দাও।"

"আচ্ছা, আমি লিখ্চি," বলিয়া বদ্দী-বৌ তখ্‌ত্‌পোষের এক ধার চাপিয়া বসিয়া মনে মনে লীলাবতীর লেখাটুকু পড়িল। ভাবিল,—ছুঁড়ীটা একেবারেই ম'রেছে ! উঃ, এমন প্রেম-পাগল ! আমিও তো এক দিন বিষম যৌবনের ভারে অস্থির হ'য়ে এক জনকে ভালবেসেছিলাম, কিন্তু এতটা হয়নি। তা লোকটা আবার নাকি ভিন জাত্‌ ! তা যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম ! যা হয় হোক-গে, আমি লিখে খালাস। এই কাগজ খানাতেই হবে,—লেখার ঢের জায়গা আছে, নীচে ছুঁড়ী নামও লিখেছে,—দাসী লীলাবতী ! বেশ, এতেই লিখি।"

এই চিন্তার পর রমণী লিখিতে সুরু করিল ; ব্রাহ্মণী নিজের দাওয়ায় গিয়া বসিলেন।

বদ্দী-বৌ লেখা-পড়ায় খুব পাকা না হইলেও প্রেম-শাস্ত্রে বিলক্ষণ পটু ! তার ভাব-ভঙ্গিমায় কত জন মজিয়াছিল—তার যৌবন-তরঙ্গে এক দিন কত জনকে খাবি খাইতে হইয়াছিল। বদ্দী-বৌ বিনাইয়া বিনাইয়া, রসের ফোয়ারা ফুটাইয়া অপূর্ব্ব ছাঁদে পত্র লিখিয়া খাড়া করিল। কিন্তু সেই ছত্র-বাঁকা, সেই কাটা-কুটি বা কালীর দাগ-পড়ার হাত এড়াইতে পারিল না।

কাটা-কুটিটা এ-হেন বিদূষী নবীনাদের লেখার একটা অপরি-হার্য্য অলঙ্কার !

বদ্দি-বৌ পত্র মুড়িয়া লীলার লেখা দেখিয়া শিরোনামায় নাম লিখিল—"মোস্তোফা খাঁ" এবং তদগ্রে "মদেকসদয় শ্রীযুক্ত" শব্দ কয়টী যোগ করিয়া দিল।

বামা বলিল,—"কি নিক্‌লে দিদি,—প'ড়ে শোনাও দিকিন ?"

বদ্দি-বৌ বলিল,—"মা-ঠাকুরুণ যা যা ব'লেছেন, তাই লিখেছি, এ আর প'ড়ব কি ?—যার পত্তর, সেই প'ড়বে। অনেক দেরী হ'য়েছে বোন, আমি এখন চ'লূলাম।" ইহা বলিয়া বদ্দি-বৌ বাহিরে আসিল,—ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"মা-ঠাকুরুণ, তবে আমি চ'লূলাম।"

ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া বলিলেন,—"লেখা হ'য়েছে মা ?"

"হ্যাঁ হ'য়েচে।"

"তবে যাও,—কিন্তু মা আমার শেষ কথাটী যেন মনে থাকে।"

বদ্দি-বৌ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"তা আর ব'লূতে হবে না মা, আপনি তার জন্যে ভাব্‌বেন না," বলিয়া বেড়া পার হইয়া চলিয়া গেল।

এদিকে বামা পত্রখানি লইয়া লীলাবতীকে বলিল,—"সই, দেখ দিকিন, কি রকম নিকেচে ?"

লীলাবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও একটু গড়ি-মিশি করিয়া পত্রখানি হাতে লইল—শিরোনাম দেখিল। পরে মোড়ক খুলিয়া নির্নি-

মেষ নয়নে নীরবে পড়িতে লাগিল। কত ক্ষণ পরে উহা মুড়িয়া বামার হাতে দিল।

বামা বলিল,—"কৈ প'ড়ে শোনালে না যে?"

বালিকা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আমি প'ড়তে পারব না—যার পত্তর, সেই প'ড়বে।"

"তবে যাই, তার কাছেই পাঠাইগে" বলিয়া বামা পত্রখানি লইয়া বাহিরে গিয়া ব্রাহ্মণীর হাতে দিল।

মিশ্র ঠাকুর ঘরের ভিতর বিশ্রাম করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণী দ্রুত-পদে তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন,—"এই নেও, পত্তর লেখা হ'য়েছে।'

মিশ্র ঠাকুর আস্তে আস্তে পত্র হাতে লইলেন, কিন্তু লেখার দিকে চাহিলেন না। তিনি চিন্তিতভাবে বলিলেন,—"লিখেছে তো, কিন্তু পাঠাবার উপায় কি? কে মোস্তফাকে চিনে তার হাতে পত্র-খানা দেবে? আর চিন্‌লেও যার-তার হাত দিয়ে তো এ পত্র দেওয়া যায় না?"

"কেন বাদল ঠাকুর-পো যাবে না? তুমি ব'ল্লে নিশ্চয় যাবে।"

ব্রাহ্মণীর এই কথা শুনিয়া মিশ্র ঠাকুর বলিলেন,—"হাঁ, ঠিক ব'লেছ, বাদলকে দিয়েই এ কাজ হবে। বাদল আসুক, সে কথা হবে খুনি।"

বাদল দাসকে পাঠক, ইতিপূর্ব্বেই একবার দেখিয়াছেন। মিশ্র ঠাকুরের বাড়ীর কিঞ্চিৎ দূরে বাদলের বাসগৃহ। বাদল ভারী চতুর, স্পষ্টবাদী ও পরোপকারী ব্যক্তি। যৌবনকালে

বাদলের দেহে অপরিসীম শক্তি ছিল; এই বৃদ্ধকালেও সে শক্তির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বাদলের সংসারে আপন বলিতে এক বৃদ্ধা ভগিনী ও একটী ভাগিনেয় ভিন্ন আর কেহই ছিল না। স্ত্রীর জীবদ্দশায় বাদল বিধবা ভগিনী ও ভাগিনেয়কে আনিয়া আপন বিষয়-সম্পত্তি দান করিয়াছিল। সেই থেকেই বাদলের সংসারের ভাবনা আর ভাবিতে হয় না—বাদল খায়-দায় আর মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়।

বাদল দাস মিশ্র ঠাকুরের ভারী অনুগত। মিশ্র ঠাকুর একে বাদলের চেয়ে বয়সে বড়, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণ, বাদল তাই মিশ্র ঠাকুরকে খুব ভক্তি করে—ভালবাসে, দাদা ঠাকুর, দাদা ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করে। সেই হিসাবে মিশ্র-পত্নী বাদলকে ঠাকুর-পো বলেন। বাদলের সকালে-বিকালে এক একবার মিশ্র ঠাকুরের বাড়ী না আসিলে ভাত হজম হয় না; বিশেষতঃ বৈকালে আসিয়া আড্ডা দেওয়াই চাই। মিশ্র ঠাকুরের মুখে ধর্ম্ম-কথা ও অন্যান্য গল্প শুনিতে শুনিতে এক এক দিন অনেক রাত্রি হইয়া যায়, তখন বাদল প্রসাদ পাইয়া সেই খানেই রাত্রি যাপন করে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীও বাদলকে খুব ভালবাসেন।

আজ যথাসময়ে বাদল দাস মিশ্র ঠাকুরের বাড়ীতে আসিল; দাদা ঠাকুর বলিয়া ডাকিয়া দাওয়ায় উঠিল। ঠাকুর ঘর হইতে বলিলেন,—"বাদল! তামাক খাও,—তোমার কথাই ভাব্‌চি।"

ঠাকুর বাহিরে আসিলে বাদল প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমার কথা কি ভাব্‌চ দাদা ঠাকুর?"

"তামাক খাও, ব'লচি—একটা পরামর্শ আছে।"

বাদল তামাক সাজিল ;—দাওয়ার দেওয়ালে-হেলানো একটা ছোট্ট হুক্কা লইয়া ফুড়ুক ফুড়ুক করিয়া টানিয়া ধূম উদ্গার করিতে লাগিল। তামাকু-সেবন সাঙ্গ হইলে মিশ্র ঠাকুর বাদলের কাছে বসিলেন,—সেখানে আর কেহ ছিল না। তথাপি ঠাকুর চুপে চুপে অনেক ক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন। সে কি কথা? আমরা শুনিতে পাই নাই, সুতরাং জগজ্জনের অগোচরে রহিল।

ঠাকুরের কথা শেষ হইলে বাদল কিছু ক্ষণ দম ধরিয়া থাকিল, ঠাকুরের কথা শুনিয়া তাহার মাথাটা যেন ঘোলাইয়া গিয়াছিল ; মাথা ঠিক করিয়া পরে সোৎসাহে বলিল,—"এর জন্যে ভাবনা কি দাদা ঠাকুর! যখন লক্ষ্মীছাড়া হিঁদুর ঘরে এমন লক্ষ্মী মেয়ের গতি হ'ল না—বিনি দোষে এমন সোণার চাঁদ মেয়ে কেউ নিতে চায় না, তখন তার একটা কেনারা তো ক'রতে হবে? তা যে যুক্তি এঁটেচেন, সে খুব ভাল—মেয়ে তো সুখে থাকবে! তবে ব'লবেন, লোক-নিন্দে, সে তো হ'য়েচেই! তার জন্যে আর ভাবা-চিন্তে কি? না হয় এ ত্রিবেণীতে আর না থাকবেন! মেয়েটীর গতি-বিধি ক'রে দিয়ে বুড়ো-বুড়ী কাশীবাসী হবেন—আমিও সঙ্গে যাব। আমি আজ-ই এই পত্তর নিয়ে গিয়ে কাজের হিশ-নিশ ক'রে আস্‌ব। এতে লোকে আমার ওপর চ'টবে—মন্দ-ছোন্দ ব'লে দুষ্‌বে? সে ভয় আমি করিনে—সে তোয়াক্কা রাখিনে। নেংটার আবার বাটপাড়ের ভয় কি? কৈ পত্তর খানা দেন দিকিন?"

তখন সন্ধ্যা হয়-হয় প্রায় হইয়াছে। বামা ঘরে ধূপ-ধূনা

দিয়া ঘর ধূমময় করিল, পরে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণী বাদলের গলার আওয়াজ পাইয়াই ঘরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি বাদলের কথায় খুব খুশী হইলেন। মিশ্র ঠাকুর যখন পত্রখানি লইয়া গিয়া বাদলের হাতে দিলেন, তখন ব্রাহ্মণী গদ্‌-গদ-ভাবে বলিলেন,—"ঠাকুর-পো! আমাদের আর কেউ নেই—উপরে ভগবান, আর নীচে সহায় তুমি, তোমার ভরসা আমরা ঢের করি। তোমার ঋণ তো শুধ্‌তে পারবো না ঠাকুর-পো!"

বাদল ভক্তিতে গলিয়া বলিল,—"বৌ-দিদি! বাদলকে কিছু ব'লতে হবে না, বাদলের প্রাণ থাকতে কেউ এ কাজে বাধা দিতে পারবে না। এই আমি চ'ললাম।"

ইহা বলিয়া মিশ্র ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বাদল দাস বাহির হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাখ্যান

সন্ধ্যার ঘোরে-ঘোবে বাদল দাস বাহিব হইল। বাদল যদিও অশিক্ষিত, কিন্তু তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা বেশ ছিল। সর্ব্বদা সৎ সংসর্গে থাকায় তাহার বেশ একটু চিন্তা-শক্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পথে বাদলের নানা চিন্তার ভিতর এই ভাবটা জাগিয়া উঠিল,—"হিন্দুর এ কি আচরণ—এ কি অত্যাচার-অবিচার! ছোঁয়া-ছুঁয়ির উৎপাতটা নিয়ে হিন্দুর এত দূর বাড়াবাড়ি!—উঃ, একটা লোকের সর্ব্বনাশ! এটা কি হিন্দুর মস্ত ভুল নয়! মানুষ তো সবাই! হিঁদু আর মুসলমান—এ তো বাইরের কথা—বাইরের বিচার! কিন্তু ভিতরে সবাই এক। ভিতরের বিচার ক'রবার সাধ্য কারো নেই; ভিতরেই ভগবানের লীলা-খেলা। সে লীলা-খেলায় হিন্দুও মগ্ন—মুসলমানও মগ্ন। তবে একটা ভাল আর একটা মন্দ হবে কেন? একের ছোঁয়াতে অন্যের জাত যাবে কেন? অশুচি হবে কেন? এ কি হিন্দুর সঙ্কীর্ণতা! তবে মানুষের ভিতর কতকগুলো অমানুষ আছে, সত্য বটে সে হিন্দুর মধ্যেও আছে, মুসলমানের মধ্যেও আছে। সেই জঞ্জালগুলো বাদ দেওয়া ভাল। কিন্তু এই যে সব মুসলমান ত্রিবেণীতে এসেছে, এরা তো জঞ্জাল নয়, এরা মানুষ!—মানুষের মত মানুষ! এরা রেতে-দিনে কত বার ভগবানকে ডাকে। এদের ডাকে স্বয়ং মা গঙ্গা দেখা দিলেন। এদের যারা মন্দ ভাবে, তারাই অমানুষ—তারাই জঞ্জাল—

তারাই পাষণ্ড! ভাগ্য ভাল মিশ্রী ঠাকুরের, যদি তার মেয়েটার গতি সেখানে হয়। মানুষের সাথে মানুষের মেলা-মেশা হবে,—ভালই হবে।”

বাদল তন্ময় হইয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাম্বুর নিকটে উপস্থিত হইল। তখন ধর্ম্মপ্রাণ দরবেশগণ নামাজ পড়িয়া বসিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে গাজী সাহেব আর তাঁহার চারিদিকে অন্য সকলে উপবিষ্ট!—শুভ্র সুন্দর পরিষ্কার পোষাক-পরা, যেন সরোবরে সব পদ্ম-ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বাদল অদূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল,—দেখিয়া মোহিত হইল—শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। যে কাজের জন্য আসিয়াছিল, সে তাহা ভুলিয়া গেল।

বাদল নীরবে দণ্ডায়মান,—যেন পাথরের মূর্ত্তি! যেন কোন্ স্বপ্ন-রাজ্যের কোন্ কুহক-পাথারে সে আপনাকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার অন্তর আনন্দ-মদিরাময়; চক্ষে উজ্জ্বল আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে দরবেশগণের সভা ভঙ্গ হইল,—অনেকেই উঠিয়া গেল। বাদল অনেক ক্ষণ ধরিয়া দণ্ডায়মান! এক জন যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি কে? দাঁড়াইয়া কেন? কি চাও?”

উদ্‌ভ্রান্ত বাদলের চমক ভাঙ্গিল। “না—কিছু চাইনে। তবে——” বলিয়া বাদল উজ্জ্বল আলোকে চাহিয়া দেখিল, যাহার কাছে সে আসিয়াছে, সে উপবিষ্ট, তাহার কাছে আরো কয়েক জন বসিয়া আছেন। বাদল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া

বলিল,—"ঐ লোকটীর কাছে আমার দরকার—দয়া ক'রে ডেকে দিলে ভাল হয়।"

"আচ্ছা দিচ্ছি" বলিয়া মোস্তফা খান বোখারীকে ডাকিয়া দিয়া লোকটী অন্য একটী তাম্বুর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

বাদল তখন বলিল,—"মশায়! আপনার জন্যে আমি অনেক ক্ষণ ধ'রে খাড়া আছি। আপনার এক খান পত্তর আছে, এই ন্যান, দয়া ক'রে প'ড়ে জবাব দেবেন: গরীব বামুন বড়ই বিপদে প'ড়েছেন, আপনি উদ্ধার না ক'রলে আর উপায় নেই।"

মোস্তফা বাদলের সব কথা বুঝিতে পারিলেন না—বাদলের আপাদমস্তক তাকাইয়া দেখিয়া পত্র লইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি ঐ খানে ব'সো।"

মোস্তফা আলোর কাছে গিয়া বসিয়া পত্র খুলিলেন। "আরে কি এ লেখা! এ-লেখা আমার পড়া সাধ্য নয়। এ বুঝি বাংলা-" বলিয়া পত্র খানা সোমেশ্বর শর্ম্মার দিকে ফেলিয়া দিলেন।

গাজী সাহেবের কাছে সোমেশ্বর শর্ম্মা, সর্দ্দার সাহেব, মুফ্‌তী সাহেব এবং আরও কয়েকটী বিশিষ্ট ব্যক্তি বসিয়া ছিলেন। পত্র ফেলিতেই গাজী সাহেব মোস্তফার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"খবর কি?"

"ঐ দেখুন—কে খত্‌ লিখেচে, ভাষাটা বাঙ্গলাই হবে। ও-খত্‌ পড়া শর্ম্মা ঠাকুরেরি কাজ।"

শর্ম্মা পত্রখানি হাতে লইয়া আলোর কাছে সরিয়া গেলেন। দেখিলেন, পত্রে এক গঙ্গা লেখা। "এ কি? এ যে মেয়েলী

হাতের ছাঁদ !—কালী-পড়া, কাটা-কুটি, ছত্তর বাঁ্যাকা ! এই যে, মেয়ে মানুষের নামও যে সই আছে। ব্যাপারটা কি ?" শর্ম্মা ঠাকুর বিস্ময়ের সহিত মুচকি হাসিলেন।

তখন অন্য সকলে শর্ম্মা ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এক জন বলিলেন,—"হঠাৎ হাসি কেন, ঠাকুর ?"

"কারণ আছে, ব'লচি।" বলিয়া শর্ম্মা ঠাকুর মনে মনে পত্র খানি পড়িতে লাগিলেন। শর্ম্মা ঠাকুব প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, পত্র খানি হয় তো কি একটা উৎকট অবৈধ প্রেমের গুপ্ত রহস্য-রস-পূর্ণ হইবে। তাই তিনি হাসিয়াছিলেন। কিন্তু পত্র পড়িয়া তাঁহার আর সে ভাব রহিল না। ফলে এ পত্রও উৎকট অবৈধ রহস্য-পূর্ণ বটে, কিন্তু সে রহস্য অন্য প্রকৃতির। শর্ম্মার মুখখানি ধীব—স্থির—গম্ভীর হইল। বালিকার দুঃখের করুণ-কাহিনী পড়িয়া তাঁহার অন্তর সহানুভূতিতে দ্রবীভূত হইল। শর্ম্মা ব্যথিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—"মেয়েটী মোস্তফার অনুরাগিণী। তা অনেক আইবুড়ো শেয়ানা মেয়ের কারু-কারুর প্রতি এরূপ অনুরাগ হয় বটে, কিন্তু বিবাহিতা হ'লে সে অনুরাগ আর থাকে না—সে কথা ভুলে যায়। কিন্তু এ মেয়েটীর ভুল্‌বার উপায় কৈ ? লিখেছে, হিন্দু-সমাজে তার স্থান নাই। কেন ? মুসলমান তারে জল থেকে ডেঙ্গায় তুলেছে—জীবন দান ক'রেছে ব'লে কি সে পতিতা—অস্পৃশ্যা হইল ?—এই দোষে সে বর্জ্জনীয়া ? উঃ কি কঠোর নির্ম্মম সমাজ ! কি ভীষণ অত্যাচার !! কত কুলের কামিনী কত অবৈধ ঘৃণ্য কাজ ক'রে পার পেয়ে যাচ্চে—কত অভিসারিকা দারুণ দুঃশীলা নারা সতী আখ্যায় ভূষিত হ'য়ে

সমাজের বুকে ধেই-ধেই নেচে বেড়াচ্ছে, সমাজ তা দেখ্‌তে অন্ধ! কিন্তু বিনা কারণে একটা অবলা বালিকার সর্ব্বনাশ সাধন ক'রতে কোমর বেঁধে উঠে-প'ড়ে লেগেছে! ধিক—শত ধিক এমন সমাজকে!

শর্ম্মার নীরব গম্ভীর মুখ দেখিয়া সর্দ্দার সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"কি ঠাকুর, বিদ্যেয় কুলিয়ে উঠ্‌চে না নাকি?"

শর্ম্মা শুষ্ক-মুখে উত্তর করিলেন,—"সেই রকমই বটে।"

"আরে কি লিখেছে, প'ড়তে পার্‌লেন না? লেখাটা কি এতই শক্ত? কিন্তু বাঙ্গলা এলেম তেমন তো নয়! যাই হোক, যে লোকটা খৎ-খানা এনেছে, সে ঐ বসে' আছে, তারেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন, সে তো সব জানে?" মোস্তফা খান বিরক্তভাবে ধড়-ফড় করিয়া ইহা বলিলেন।

শর্ম্মা বলিলেন,—"তারে জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে না—আমি সব প'ড়েছি, তবে লেখাটা কাঁচা হাতের কিনা—অক্ষরগুলি গায় গায় ঘেঁষা-ঘেঁষি-কাটা-কুটি, তার ওপর কালীর দাগ-পড়া, প'ড়্‌তে কষ্ট পেতে হ'য়েছে।"

এই সময়ে গাজী সাহেব বলিলেন,—"খবরটা কি বলুন দেখি?"

"খোশ খবর! কিন্তু আবার বিষাদময়! একটী মেয়ে—যুবতী, তার নাম লীলাবতী; সে বামুনের মেয়ে। সে তার বাপ-মার হুকুম নিয়ে এই পত্র লিখেছে। আমাদের মোস্তফা সাহেবের উপরে তার ভারী টান—অতি অনুরাগ। মোস্তফা সাহেবের রূপ-গুণের কথা শুনে তাঁর পায় সে জীবন-যৌবন-প্রাণ সঁপেছে।

মোস্তফা সাহেবের জন্যে সে হয়রাণ—সে পাগল। যদি মোস্তফা সাহেব এখন দয়া ক'রে তারে পায় রাখেন—সাদী করেন!—ইহাই তার, আর তার বাপ-মার কাতর প্রার্থনা—অন্তরের আকুল বাসনা। মোস্তফা সাহেব তারে চেনেন—তারে দরিয়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

শর্ম্মার মুখে পত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। মোস্তফা চরিত্রবান, পরোপকারী যুবক, সে কি গোপনে কোন প্রেমাভিনয় করিবে? মনে এই প্রশ্ন লইয়া সকলে মোস্তফার মুখের দিকে চাহিলেন। এদিকে মোস্তফা খান কিন্তু আগুন! শর্ম্মার কথা শুনিয়াই ভয়ানক চটিয়া উঠিয়া রুক্ষ উপেক্ষার স্বরে বলিলেন,—"উহ্ কাফের-কন্যার কি স্পর্দ্ধা—কি দুরাশা! তাব বাপ-মারও কি বুকের পাটা। তাদের মেয়েটা দরিয়ায় ডুবে মরে' যাচ্ছিল, তারে কষ্ট করে তুলেছি—উপকার ক'রেছি, এরি জন্যে সে আস্‌মানে উঠ্‌তে চায়? তারে আমার সাদী ক'র্‌তে হবে! কি বিড়ম্বনা! এ পাগলামী পত্রে লিখেছে কোন্ সাহসে? ধিক্ তার পত্রে—ধিক্ তারে!"

শর্ম্মা ঠাকুর বলিলেন,—"মোস্তফা, স্থির হও—রাগ ক'রো না। তোমারই জন্যে সে দরিয়ায় ডুবেছিল, তা জান? আবার তুমিই তারে……"

মোস্তফা খান বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমার জন্যে? আমি তারে ডুব্‌তে ব'লেছিলাম? কোথাকার সে? কে তারে চেনে? আশ্চর্য্য আর কি!"

"না, আমি ব'ল্‌তে ভুলেছি, মোস্তফা সাহেব! তোমার জন্যে

নয়, তোমার ঐ রূপের জন্যে—তোমার ঐ সুঠাম সুন্দর চেহারার জন্যে। এই দেখ পত্রে কি লিখেছে,—'তোমার ভুবন-মোহন রূপ দেখে আমি আপন-হারা হইছিলাম—জ্ঞানহারা হ'য়ে ডুবে গিইছিলাম।' এখন বুঝ্‌লে?"

"তা হ'লে তো দেখ্‌চি—আমার এ চেহারাটাকে বদ্‌লে ফেল্‌তে হয়। না হয়, তাম্বুর এক কোণে আঁধারে মুখ লুকিয়ে প'ড়ে থাক্‌তে হয়—বাহিরে এ চেহারা নিয়ে বেরুতে হয় না। আর যদি বেরু-ই, তবে ধূলো-কাদা-কালী মেখে চেহারাটাকে বিশ্রী বদ্‌খৎ গোচের ক'রতে হয়। তাই না?"

মোস্তফার এই কথায় সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। গাজী সাহেব মৃদু হাসিয়া ব্যাপারখানা কি, বুঝিতে চেষ্টা করিলেন।

শর্ম্মা ঠাকুর একটু থতমত খাইয়া বলিলেন,—"তুমি যে একটু উল্টা বুঝ্‌লে সাহেব! একটা অবলা—একটা নিরাশ্রয়া বালিকা—তারে তুমি দেখেছও; সে দেশ খুব সুরত আর কুমারী, তার বিয়ে-সাদী হয়নি। সে যদি তোমার আশ্রয় চায়—আপন খুশীতে সাদী ক'রে তোমার আপন হ'তে চায়, তা হ'লে হানি কি আছে? আর এক দিন তো তোমাকে সাদী ক'রতেই হবে। তা 'যাচা ক'নে, কাচা কাপড়' কেউ কি ছাড়ে সাহেব?"

মোস্তফা উত্তেজিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"জান্‌বেন শর্ম্মা ঠাকুর! বিয়ে-সাদী ক'রতে এদেশে আমরা আসিনি—বিয়ে-সাদীর খেয়ালও আমাদের নেই। আরাম-আয়েশ, ধন-দৌলত আমরা চাই না,—আমরা চাই দীন-ইস্‌লাম জারি

ক'রতে—আমরা চাই "লা-ইলাহা ইল্লাল্ল্" এই পবিত্র বাণী এ দেশের আওরত-মর্দ্দকে বুঝাইতে, আমরা চাই এদেশের ধর্ম্মের ধাঁদা ঘুচিয়ে এদেশে সেই একমাত্র সত্য স্বরূপ খোদা-তা'লার এবাদৎ-আরাধনা প্রতিষ্ঠা ক'রতে। আর চাই—দুঃখীর দুঃখ মোচন, বিপন্নের বিপদ-উদ্ধার, কাঙ্গাল-মিস্‌কীনের উপকার ক'রতে। এতে যদি এদেশের লোকে বাদী হয়, হউক। প্রাণ যায় যা'ক,—মোস্‌লেম-সন্তান সে ভয় করে না—ধর্ম্ম-পথে প্রাণ দিতে মুসলমান খুশী বৈ দুঃখ মনে ক'রে না! জান্‌বেন ঠাকুর, আল্লাই আমাদের ভরসা—আল্লাই আমাদের সহায়! আল্লা সর্ব্ব জ্ঞানময়, সর্ব্ব শক্তির মূল।"

মোস্তফার এই সহৃদয়তাপূর্ণ সুন্দর উত্তর শুনিয়া সকলের অন্তর আহ্লাদে ভরিয়া গেল—মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। স্বয়ং গাজী সাহেব স্ফীত-বক্ষে বলিলেন,—"সাবাস মোস্তফা! সাবাস তোমারে! তুমিই ইস্‌লামের যথার্থ প্রিয় সন্তান! তোমা হ'তে মোস্‌লেমের মুখ উজ্জ্বল হবে।—আল্লা তোমার কথা যেন সফল করেন।"

শর্ম্মা ঠাকুর স্তম্ভিত! এমন সততা, এমন সদম্ভ ধর্ম্ম-প্রাণতার কথা তিনি কখন কাহার মুখে শুনেন নাই। হর্ষে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ভাবিলেন,—"সাধে কি মুসলমান সর্ব্ব দেশে গৌরব ও সম্মান লাভ করিয়াছে? এমন নির্ম্মল-চেতা, মহান-চরিত্র, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় যুবা যে ধর্ম্মে, সে ধর্ম্মের উন্নতি না হইবে কেন? সে ধর্ম্মে লোকের ভক্তি না দৌড়িবে কেন?" মোস্তফার প্রতি শর্ম্মার অন্তর ভক্তিতে নুইয়া পড়িল।

এদিকে কিন্তু আবার পত্র-পাঠ করিয়া সেই অবলা বালিকার প্রতি তাঁহার যে সহানুভূতি জন্মিয়াছিল—যে কর্ত্তব্যের সাড়া তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতে তিনি বিচলিত হইলেন না;—বলিলেন,—"সাহেব! তোমার সৎসাহস, তোমার সততা, ধর্ম্মে তোমার অচলা ভক্তি দেখে, আমি বিস্মিত—মোহিত হইচি। খোদা তোমার মঙ্গল করুন—তোমার ভাগ্য উজ্জ্বল হউক, খোদার কাছে ইহাই আমার প্রার্থনা। কিন্তু একটী কথা,—নিরাশ্রয়া অবলাকে আশ্রয় দেওয়াটাও কি ধর্ম্মের একটা অঙ্গ নয়? ভাবো দেখি, জগত-গুরু হজরত রসুল কি করিয়াছিলেন? বদরের লড়াইয়ে বিবি জয়নব বিধবা হ'য়ে নিরাশ্রয়া হন—হজরত তাঁকে আশ্রয় দিইছিলেন। বিবি ওম্মে-হাবিবা বিধবা হ'লে তাঁর আপনার লোকেরা তাঁকে ত্যাগ ক'রেছিল। বিবি শেষে নিরুপায় হ'য়ে হজরতের চরণ-তলে থেকে দীন ও দুনিয়া বজায় ক'রতে নিবেদন ক'রলে হজরত তাঁরে সাদী ক'রতে কি অমত ক'রেছিলেন? যখন হজরত নিজে এই দয়া-ধর্ম্মের কাজ ক'রে গেছেন, তখন মোস্তফা! বল দেখি, এই যুবতী নিরাশ হবে কি জন্যে?"

মোস্তফা পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণ আবেগে বলিলেন,—"হজরত কি কাফের-কন্যাকে সাদী ক'রেছিলেন? কাফেরের মেয়ে? কখনই না। পুতুল-পূজায় মাতোয়ারা হিন্দুর মেয়েকে মুসলমান কখনই সাদী ক'রতে পারে না—সাদী হয় না। আলো আর আঁধারে কি মিশ খায়? অসম্ভব! অসম্ভব! টেনে ফেলে দেন দূরে ও খৎ খানা—ও কথা আর মনেও ঠাঁই দেবেন না।"

মোস্তফার এই দৃঢ়তা দেখিয়া গাজী সাহেব হৃষ্টচিত্তে কহি-লেন,—"ঠিক ঠিক,—ঠিক ব'লেছ মোস্তফা! অংশীবাদী হিন্দুর মেয়ের সাথে মুসলমানের সাদী হ'তেই পারে না। কিন্তু মোস্তফা! যদি হিন্দুর মেয়ে মুসলমান হয়—দেলজানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কবুল ক'রে ইমান আনে? তখন কি হবে, মোস্তফা? বল দেখি, তখন কি সাদী হ'তে পারে না?"

মোস্তফা নিরুত্তর, কি বলিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না।

শর্ম্মা বলিলেন,—"মোস্তফার কথা যথার্থ বটে, পুতুল-পূজকের কন্যা মুসলমান বিবাহ ক'র্‌তে পারেন না। কিন্তু এ যুবতী যখন মোস্তফার অনুরাগিণী, তখন কি তার আর মুসলমান হ'তে বাকী আছে? না বাকী থাক্‌বে?"

"বাস্! যদি তাই হয়, তবে আর আপত্তি কি? এটা নেক কাম, আর এদেশে ইস্‌লাম-পত্তনের একটা পাকা ভিত্তি হবে।"

গাজী সাহেবের এ কথায় সকলে সহর্ষে সায় পূরিলেন।

এদিকে বাদল দাস নীরবে বসিয়া সমস্তই শুনিতেছিল, তাহার মনে একটা বিষম খট্‌কা বাধিল। সে ভাবিল,—"এ কি! এখানেও যে বাচ-বিচার!—ছোট বড় মানামানি! তবে কি মুসলমানের চেয়ে হিন্দু খাটো? খাটো বৈ কি! হিন্দুর মেয়ে যখন মুসলমানে নেয় না—সে মুসলমান না হ'লে ছোঁবে না, তখন হিন্দু খাটো বৈ কি? কিন্তু না, যুক্তিতে তা তো আসে না! মুসলমানের দেবতা মাত্তর একটা—এক আল্লা বৈ গতি নাই! আল্লার কাছেই যত মুসলমান কাঁদা-কাটি করে, এক আল্লা কোন্ দিকে ঠেকাবেন! কিন্তু হিন্দুর? হিন্দুর ব্রেহ্মা, বিষ্টু, শিব,

দুগ্গা, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইন্দ্র, রাম, কৃষ্ণ, সীতা, রাধিকা—কত দেবী, কত দেবতা—তেত্রিশ কোটি দেবতা! মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর বল কত! তবে হিন্দু ছোট কিসে? হিন্দু খাটো কিসে? এতগুলি দেবতা যাদের সহায়, তারা খাটো! কে বলে তাদের খাটো? আসুক দিকি মিশ্রী ঠাকুরের সাথে বিচারে! দেখি কে জেঁতে, কে হারে! বিচারে যদি মিশ্রী ঠাকুরের হার হয়,—হিন্দু-ধর্ম্ম খাটো হয়, তবেই না! তবে তাঁর মেয়ের তো কথাই নাই, আমি যে বাদল দাস আমিও এদের ধর্ম্মে যাব—মুসলমান হব—এদের কাছে থাকৃব। ধর্ম্মের জন্যেই তো মানুষ? ধর্ম্ম যদি না হয়, তো মানুষ কিসের?"

যখন বাদল দাস এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, সেই সময়ে শর্ম্মা ঠাকুর তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন,—"তুমিই কি পত্র এনেছ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তা মশাই! এঁরা বার,বার কাফের কাফের ব'ললেন—কাফের কি মশাই?"

শর্ম্মা হাসিয়া বলিলেন,—"বাপু হে! কাফেরের মানে কি শুন্‌বে? যে প্রকৃত ঈশ্বরের দিক্ থেকে মুখ ফেরায়, তারেই কাফের বলে। আমরা যে ধর্ম্মে আছি, সেই এক আল্লার পূজা যে মানে না, কিন্তু নানা মন-গড়া দেব-দেবীরে ভজে, আমরা তারে কাফের বলি। নইলে কাফের একটা শক্ত গালি নয়; আবার ভাব তো গালি। বুঝেছ? সে কথা যাক্, তুমি সেই মেয়েটীর মা-বাপকে ব'ল্‌বে, তাঁদের মেয়ে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে না এলে এঁরা গ্রহণ ক'রতে রাজী নয়, বুঝ্‌লে!"

"আজ্ঞে বুঝেছি, কিন্তু জাত্ খোওয়াবে কিসের জন্যে?

জাত্ দিয়ে মেয়ে দেওয়া! হিন্দু কি এত ছোট, তাই আগে-ভাগে জাত্ খোওয়াতে যাবে?"

বাদলের মুখে এই তর্কের কথা শুনিয়া শর্ম্মা বলিলেন,—"ওহে হিন্দুকে আমরা ছোট ব'লচিনে, মন্দও ব'লচিনে; তবে হিন্দুর ধর্ম্ম-মতটা ভাল নয়।"

"আজ্ঞে তবেই তো হল! কিন্তু বিনি বিচারে ছোট-বড় কি বোঝা যায়? বিচার চাই।"

"আমরাও বিচারে রাজী আছি! কিন্তু বিচার ক'রবে কে?—তুমি?"

"আজ্ঞে আমি কেন? আমাদের মিশ্রী ঠাকুর—মেয়ের বাবা! তিনি খুব পণ্ডিত। কত বিদ্যেবাগীশ, কত তোয়াক্কালঙ্কারের সঙ্গে তিনি চুল-চিরে শাস্তর-বিচের করেন। তিনিই আপনাদের সঙ্গে বিচের ক'রবেন। বিচারে যদি হার হয়, হিন্দু-ধর্ম্ম খাটো হয়, তবেই না—তবেই না মুসলমান হওয়া! নইলে কেন হবে।"

শর্ম্মা ঠাকুর বাদলের কথায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া প্রীত হইলেন, কহিলেন,—"উত্তম, ধর্ম্ম-বিচারই আমাদের কাজ। তা তোমাদের পণ্ডিত মহাশয় এখানে আসবেন—না আমরা তাঁর ওখানে যাব?"

"আগে সব কথা তাঁরে বলি,—তার পরে যা হয়, সে খবর আমার কাছে পাবেন। এখন আমি বিদেয় হই।" ইহা বলিয়া বাদল দাস জোড়-হাত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নিরাশ-সংবাদে

সে রাত্রে বাদল দাসী আর মিশ্র ঠাকুরের বাড়ী আসিল না; চিন্তিত-চিত্তে নিশা যাপন করিয়া প্রাতঃকালে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। মিশ্র ঠাকুর বাদলের কথা শুনিয়া দুঃখে, অপমানে, লজ্জায় অভিভূত হইলেন—অন্তরে যেন কি একটা জ্বালা ধরিল।—কি! নিত্য দেব-দেবী-সেবা-রত ভগবদ্ভক্ত হিন্দুর কন্যা—বিশেষতঃ এক জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কন্যা-গ্রহণে মুসলমানেরও আপত্তি—কুণ্ঠা! মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে লইতে অনিচ্ছা! কি ভণ্ডামী! কি ধৃষ্টতা! যাহাদের সংস্পর্শ-দোষে এই দারুণ দুর্গতি—লাঞ্ছনার এক-শেষ, তাহাদের মুখে এহেন বিপরীত কথা—উল্টা চাপ! ওঃ! এর চেয়ে ঘৃণা, দুঃখ, অপমান আর কি হইতে পারে? তারা ব'লেছে, হিন্দুর ধর্ম্ম খাটো! কি স্পর্দ্ধা! তাদেরি ধর্ম্ম বড়! সত্য সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের চেয়ে বড়—শ্রেষ্ঠ! কিছুতেই না—পূর্ব্ব-দিকের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হ'লেও না। কোন্ সাহসে তারা এ কথা বলে!—আর কোন্ সাহসে তারা ধর্ম্ম-বিচার ক'রতে চায়! ধর্ম্ম-বিচার কি যারে তারে সাজে? আচ্ছা দেখা যাবে, গণপতি মিশ্র স্মৃতি-শ্রুতি-বেদ-বেদাঙ্গ-পুরাণ-উপপুরাণ সব জানে—ধর্ম্ম-বিচারে অশক্ত নয়। কত দিগ্‌গজ পণ্ডিত যে গণপতির জটিল প্রশ্নে—কূট তর্কে ঘোল খেয়ে গেল, এই অন-ভিজ্ঞ লোকেরা তার উপরে ছক্কা মারতে বাঞ্ছা করে! কি সাহস!!

মিশ্র ঠাকুর এইরূপ চিন্তা মাথায় লইয়া অন্দরের দাওয়ায় গিয়া গৃহিণীকে ধীরে ধীরে অথচ বিষম বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"হ'ল তো! পত্র লেখো—পত্র লেখো, পত্র লিখেও তো এই হ'ল! জাত্ গেল, পেট ভ'রল না! হায়, অদৃষ্টে এতও কি বিড়ম্বনা ছিল।"

মিশ্র-পত্নী চকিতভাবে বলিলেন,—"কি হ'য়েচে? পত্রের উত্তর এসেছে নাকি?"

"এসেছে—আমার মাথা এসেছে—আমার মুণ্ডু এসেছে?" এই বলিয়া মিশ্র ঠাকুর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"তোমার কথা তো কিছুই বুঝ্তে পাচ্চিনে? বলি, খবরটা কি রকম এসেছে বল দিকি?"

"যা আস্বার তাই এসেছে। আরে তারা কি হিন্দুর মেয়ে নেয়!—না ছোঁয়! হিন্দু মুসলমান না হ'লে তারা সমাজে গ্রহণ করে না। এ কথা শুনেও যে প্রাণ ফেটে যাচ্চে! আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, হিন্দু কি জন্যে মুসলমান হবে? হিন্দু কি ছোট? হিন্দুর ধর্ম্ম কি নীচ—হেয়, তাই হিন্দু স্বধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হবে—জাত্ দেবে? কি আস্পর্দ্ধা! "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

মিশ্র ঠাকুর ইহা বলিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিশ্র-পত্নী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছল্ছল্-নেত্রে বলিলেন,—"আর আমি কি ব'ল্ব? আমার অন্তরে যা হচ্চে, তা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন। হায়, এমন অভাগিনীও আমার উদরে জন্মেছিল।"

মিশ্র ঠাকুর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন,—“অভাগ্য আমার, নইলে এমনটী ঘ’ট্‌বে কেন? আবার তারা আমার সঙ্গে ধর্ম্ম-বিচার ক’রতে চায়—বিচারে হারিয়ে হিন্দু ধর্ম্মকে হেয় প্রমাণ ক’রতে চায়—আরে সেটী কি হবার যো আছে! আমি কি হারবার ছেলে! তাই হেরে মেয়েটীরে নিয়ে তোমাদের ধর্ম্মে যাব! তা মনেও ঠাঁই দিও না—সে গুড়ে বালি। তবে ধর্ম্ম-বিচার ক’রতে আমি বিমুখ নই। আমি তাদের আহ্বান ক’রব—ধর্ম্ম-বিচার ক’রব—আজ রাত্রিতেই ধর্ম্ম-বিচার হবে। দেখি তাদের বিদ্যের দৌড় কত দূর—তারা হারে, কি আমি হারি, দেখা যাবে।”

ইহা বলিয়া মিশ্র ঠাকুর বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া বাদল দাসকে বলিলেন,—“বাদল! সন্ধ্যার পরই তুমি আস্‌বে। তাদের আহ্বান ক’রে আন্‌তে হবে। আর বুঝেছ, ঐ আম-গাছতলা-টায় তাদের বস্‌বার ঠাঁই ক’রে দিতে হবে, দাওয়ায় নয়, মনে থাকে যেন।”

“যে আজ্ঞে, আমি তাদের খবর দিয়ে আগেই চ’লে আস্‌ব।” বলিয়া বাদল প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

মিশ্র-পত্নী আজ বড় উদ্বিগ্ন, মনে মনে কত কি ভাবিতেছেন। ভাবিতেছেন,—‘স্বামীর হার-ই হোক, হার না হ’লে আমার নীলির গতি হবে না।’ আবার ভাবিতেছেন,—‘ছি ছি! আমার একি কামনা! স্বামী পরম দেবতা, সতী নারী স্বামীর মঙ্গল কামনাই করেন! কিন্তু আমার এ কুমতি কেন? এ পাপ-চিন্তা কেন? পতি-নিন্দা শুনে সতী দেহ-ত্যাগ ক’রেছিলেন,

'এ তো জানি! তা জেনে-শুনেও কি কামনা ক'রছি! আমার নরকেও ঠাঁই হবে না! দূর হোক এ চিন্তা মন হ'তে! আমার স্বামীর জয় হোক, স্বামীই সতীর গতি—মুক্তির সহায়!'—বৃদ্ধা অবশেষে আকাশ পানে চাহিয়া কর-যোড়ে গদ-গদ-কণ্ঠে কহিলেন,—"হে ঠাকুর! নিরাশ ক'রো না—আমার অবলারে ঠাঁই দিও—রক্ষা ক'রো। তুমিই অগতির গতি—কাঙ্গালের সহায় ভগবান্!"

বৃদ্ধা কন্যার কল্যাণ-কামনায় নিয়তই এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর যুগপৎ আশা এবং নৈরাশ্যের বাতাসে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম-বিচার

নিস্তব্ধ রজনী। নীরব প্রকৃতি। পল্লী সাড়া-শব্দহীন! ক্বচিৎ কোন কোন বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার লইয়া সকলে ব্যস্ত। এহেন সময় মিশ্র ঠাকুরের বহির্বাটীতে সম্মুখের একটী বৃক্ষতলে ক্ষুদ্র মজলিস্। গাজী সাহেব শুভাগমন করিয়াছেন। সঙ্গে আসিয়াছেন সর্দ্দার সাহেব, মুফ্‌তী সাহেব, সোমেশ্বর শর্ম্মা, মোস্তফা খান বোখারী আর দুই জন নব-দীক্ষিত মুসলমান। সকলেই উপবেশন করিয়াছেন। ইঁহাদের সম্মুখে পৃথক আসনে উপবিষ্ট গণপতি মিশ্র, পার্শ্বে এক খানি ক্ষুদ্র জল-চৌকীর উপরে কাপড়ে জড়ানো কতকগুলি পুঁথি। দুই দিকে দুইটী প্রদীপ টিপ্‌টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে! বাদল দাস্ চারিদিকের তত্ত্বাবধান করিতেছে।

গাজী সাহেব চৌকীর উপরে বস্ত্র-মণ্ডিত স্তূপাকার জিনিসগুলি দেখিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সোমেশ্বর শর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও সব কি?"

ইঙ্গিত বুঝিয়া মিশ্র ঠাকুর কহিলেন,—"এ সব আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ - ধর্ম্ম-তর্ক ক'রতে হ'লে শাস্ত্র-গ্রন্থের দরকার। তা আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থ কৈ? ধর্ম্ম-বিচার ক'রতে এসেছেন, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ আনেন নাই! বিনা অস্ত্রে কি যুদ্ধ হয়?"

ইহা শুনিয়া সোমেশ্বর শর্ম্মা সহাস্যে বলিলেন,—"সে অস্ত্র আমাদের মুখে।"

মিশ্র ঠাকুর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"সে কি প্রকার ?"

সোমেশ্বর বলিলেন,—"আমাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থের নাম কোরাণ-শরীফ। কোরাণ অপৌরুষেয়—ঈশ্বরের বাণী! আমাদের ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নিকট সেই বাণী অবতীর্ণ হয়। আজ যদি এখানে জগতের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ ভস্ম করিয়া ফেলা হয়,—কোরাণ, বেদ, বাইবেল, পুরাণ, ভাগবতাদি ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু কোরাণ কিছুতেই ধ্বংস হইবে না,—কোরাণ অক্ষয়—কোরাণ নিত্য-কাল স্থায়ী। ঐ যে দেখিতেছেন মুফ্‌তী সাহেব, উনি সমস্ত কোরাণ খানি অবিকল আওড়াইয়া দিতে পারেন—একটী আকার-ইকারেরও ভূল-ভ্রান্তি হইবে না। কেবল মুফ্‌তী সাহেব নন, মুফ্‌তী সাহেবের মত শত শত ধার্ম্মিক মুসলমান বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা কোরাণ খানি অভ্রান্তরূপে আগা-গোড়া মুখস্থ বলিতে পারেন। এই স্মৃতিধর মহাত্মগণ 'হাফেজ' বলিয়া পরিচিত। কেবল ভারতে নয়, সারা দুনিয়ায় এই হাফেজ সাহেবদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। তাই বলিতেছিলাম, কোরাণের বিনাশ-সাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের ইস্‌লাম-ধর্ম্মই যে সত্য—জীবন্ত এবং খোদা-তা'লার মনোনীত সনাতন ধর্ম্ম, আর পবিত্র কোরাণ যে একমাত্র ঐশী গ্রন্থ, ইহাই তাহার অন্যতম প্রমাণ, ইহাতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন।"

মিশ্র ঠাকুর ইহা শুনিয়া অবাক্—আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। "ধর্ম্মগ্রন্থ খানি আদ্যন্ত মুখস্থ! এ বড় কম কথা নয়। আমাদের কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সামবেদ আবৃত্তি করেন বটে, কিন্তু সমগ্র বেদ আবৃত্তি ক'রতে পারেন, এমন পণ্ডিত তো দেখিনে!

উঃ, মুসলমানের কি ধর্ম্মময় জীবন! আমি ধর্ম্ম-বিচার ক'র্‌বো বলে, এতগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ জড় ক'রেছি, আর এদের খালি হাত-পা নিয়ে আগমন! সত্যই তো এদের ধর্ম্ম জীবন্ত!" মিশ্র ঠাকুর কিছু ক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"বেশ, মুখেই আপনাদের শাস্ত্র আছে, শুনে সুখী হ'লাম। কিন্তু মহাশয়! আপনি ব'ল্‌লেন,—আপনাদের ধর্ম্মের নাম ইস্‌লাম। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ইস্‌লাম ধর্ম্মের স্বরূপ কি?"

সোমেশ্বর শর্ম্মা ইহা শুনিয়া গাজী সাহেবকে প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝাইয়া বলিলেন। গাজী সাহেব কহিলেন,—"আমাকে আর বলার দরকার কি? ইস্‌লামের পূর্ণ শিক্ষা আপনি পেয়েছেন, আপনিই এ সওয়ালের জবাব করুন। দরকার হ'লে কোন কথা আমাকে সুধাবেন।"

তখন সোমেশ্বর আচার্য্য মিশ্র ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত মহাশয়! ইস্‌লাম কি, শ্রবণ করুন। ইস্‌লাম জগদীশ্বরের একমাত্র মনোনীত ধর্ম্ম। ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলেন,—"কুল্‌হু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ, লাম ইয়ালেদ, ওলাম্ ইউলাদ্, ওলাম ইয়া কুল্‌লোহু কুফুয়ান আহাদ্" অর্থাৎ ইস্‌লামের আল্লা এক—ইস্‌লামের আল্লা অদ্বিতীয়,—এক আল্লা ছাড়া ইস্‌লামের আর আল্লা নাই; আল্লার অংশ কিংবা অংশী কেহই নাই। আল্লা স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, ক্ষুদ্র নহেন, বৃহৎও নহেন। আল্লা অবিনাশী, অরূপ, আল্লা কল্পনার অতীত নিরাকার নিত্য জ্যোতিঃ-স্বরূপ, সর্ব্ব সদ্‌গুণের আধার, সর্ব্ব ত্রুটি হইতে মুক্ত! তিনি সদা জীবন্ত—সদা জাগ্রত।

দরাফ খান গাজী

এই যে পৃথিবী—পৃথিবীস্থ পাহাড়-পর্ব্বত, হ্রদ-নদী, বৃক্ষ-লতা, মনুষ্য-পশু, পক্ষী-কীট,—গগনস্থ চন্দ্র-সূর্য্য, নক্ষত্র, মেঘমালা, সমস্তই তাঁহার সৃষ্ট। আল্লার মহিমার অন্ত নাই, করুণার সীমা নাই, শক্তির তুলনা নাই। তাঁহারই করুণায় গাছে ফল ধরে, মেঘে জল ঢালে, বাতাস জীবের জীবন জুড়াইয়া দেয়, তাঁহারই মহিমায় কুসুম হাসে, বিজলী ত্রাসে, বজ্র-নাদে হৃদয় কাঁপায়; তাঁহারই শক্তিতে চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়-অস্ত। তাঁহারই আজ্ঞায় জীবের সৃষ্টি, তাঁহারই আজ্ঞায় জীবের মৃত্যু। জগতের সহজ ও সুখদ, অতি কঠোর ও কষ্টসাধ্য তাবত কার্য্যই তাঁহার ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আল্লাই জগতের সর্ব্বময় প্রভু ও প্রতিপালক, এবং বিচার-দিনের অধিপতি। আল্লা মহান্, অনাদি, অনন্ত, পূর্ণ পবিত্র ও প্রেমময়। আল্লা জাত নহেন এবং কাহার জন্ম-দাতাও নহেন। আল্লা দুনিয়া-বাসীর কার্য্য উদ্ধারের জন্য মানুষের পেটে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। এহেন আল্লার উপর নির্ভর করিয়া উপাসনা করাই ইস্‌লাম-ধর্ম্মের বিধি; মুসলমান এই ইস্‌লামেরই সেবক, মুসলমান এই ইস্‌লামেরই ভক্ত। সকল দেশে সকল সময়ে মুসলমান এই ইস্‌লামের—এক আল্লারই সাধনা করেন। এই ইসলাম প্রচার হইয়াছে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) হইতে। তিনি আল্লার রসুল—তত্ত্ববাহক,—পুণ্যচরিত মহাতাপস। মুস্‌লমান তাঁহারই মতানুসারে চলিতে এবং তাঁহাকে ভক্তি ও সম্মান করিতে বাধ্য। মুসলমানের ধর্ম্ম-গ্রন্থের নাম কোরাণ। কোরাণ আল্লার বাণী, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকট অবতীর্ণ হয়। কোরাণ অবিনশ্বর

এবং অবিকৃত। ইহা প্রথমে হজরতের মুখে যে আকারে যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, আজ শত শত বৎসর অতীত হইলেও তাহাই আছে,—তাহার বিন্দু-বিসর্গও তফাত হয় নাই। কোরাণ শিক্ষা দেয় উপাসনার প্রতিষ্ঠা করিতে, আল্লার সহিত মানুষের অন্তরের সাক্ষাৎ যোগ সাধন করিতে। এমন নীতি-পূর্ণ ধর্ম্ম-গ্রন্থ জগতে আর নাই। আমরা এ দেশের নর-নারীকে এই পবিত্র কোরাণের উপদেশ গ্রহণ করিতে,—ইস্‌লাম গ্রহণ ও সত্য উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।"

মিশ্র ঠাকুর স্থিরমনে ইহা শুনিয়া ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিলেন, সে অতি উত্তম, সে অতি উপাদেয়। এই যদি আপনাদের ইসলাম-ধর্ম্ম হয়, তবে আর সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত তফাত কি আছে? ইহাই তো বৈদিক ধর্ম্ম! হিন্দু তো এই ধর্ম্মেরই উপাসক! হিন্দু তো এই ভাবেই ভোর হ'য়ে

"অচিন্ত্যাব্যক্ত রূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে,
সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।"

অর্থাৎ অচিন্ত্য, অব্যক্ত্য, নির্গুণ অথচ গুণাত্মক, সেই বিশ্বের আধার-মূর্ত্তি ব্রহ্মকে নমস্কার করি, বলেন। কিন্তু একটী কথা,—আপনারা চিন্ময় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক! কিন্তু তিনি শুধুই কি নিরাকার? তা তো নয়। তিনি সাকার-নিরাকার নানা রূপে, নানা ছাঁদে, নানা ভাবে ভবে লীলা ক'রচেন। তিনি লীলাময়,—তিনিই আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। শাস্ত্র বলেন:—

"ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী,
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি।"

তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, তিনি স্বগুণ, তিনি নিগু'ণ, তিনিই সব। আগুনের তাপ আমরা ভোগ করি, তাপকে কেউ দেখ্‌তে পাই না। কিন্তু আগুন না থাক্‌লে কি তাপের অনুভূতি হয়? বুঝে দেখুন,—সাকার আগুন আছে ব'লেই তো নিরাকার তাপের অনুভূতি! সেই জন্য আমরা বলি, সাকার উপাসনা ভিন্ন নিরাকার উপাসনায় অধিকার জন্মে না। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের এক মাত্র উপায়ই সাকার উপাসনা। শব্দ নিরাকার—অদৃশ্য পদার্থ, অক্ষর সাকার—দৃশ্য পদার্থ। সাকার অক্ষরের জ্ঞান না হ'লে কি নিরাকার শব্দের গঠন ও শব্দ-জ্ঞান হয়? পৌত্তলিক না হ'লে মূর্ত্তি-পূজা না ক'রলে কেউ পর-ব্রহ্মে পৌঁছিতে পারে না—নিরাকার পূজায় শক্তি জন্মে না। বৃক্ষটী কেমন যে জানে না, ফল-ফুলও দেখে নাই, বীজ দেখে' সে কি বৃক্ষের আকার ধারণা ক'রতে পারে? না তাতে ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মে?"

সোমেশ্বর শর্ম্মা ইহা শুনিয়া হাস্যমুখে গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"হিন্দু-সমাজের অল্পজ্ঞান ব্যক্তিরাই একথা বলে. কিন্তু আপনার ন্যায় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের মুখে ইহা শোভা পায় না। বলুন দেখি, যে ব্যক্তি জন্মান্ধ ও মূর্খ, অক্ষর কি, জানে না—চেনে না, তার শব্দ-জ্ঞান হয় কোথা থেকে? ঐটী আম, ওটী জাম, ঐটী টাকা, সেটী বাক্‌স প্রভৃতি শব্দ কাণে পৌঁছিলেই সে বোঝে কিরূপে? হিন্দু-শাস্ত্রেই আছে,—

"ভূস্তে আদির্ম্মধ্য ভুবঃ স্বস্তে শীর্ষং বিশ্বরূপোঽসি ব্রহ্ম।"

ব্রহ্ম ! এই বিশ্বই তোমার রূপ, ইহার ভূলোক তোমার আদি, মধ্যস্থল ভূবর্লোক এবং শীর্ষভাগ স্বর্গলোক।—হিন্দু ধর্ম্মের এ কথা যদি সত্য হয়, হিন্দু যদি এ কথা মানে, তবে বীজ-স্বরূপ এই বিশ্ব-সৃষ্টি দেখিয়া সেই বৃক্ষ-স্বরূপ অরূপ অব্যয় পর-ব্রহ্মের জ্ঞান না পাইবে কেন ? যে তাহা পায় না, সে নয়ন থাকিতে অন্ধ, জ্ঞান সত্ত্বেও অজ্ঞান ও অধম। ফলতঃ পুতুল-পূজার দ্বারা—হাতে-গড়া মূর্ত্তির উপাসনা দ্বারা সর্ব্বব্যাপী সত্য-স্বরূপের উপাসনা কিছুতেই হইতে পারে না। আঁধারে ডুবে থাকৃলে কি চক্ষে আলো দেখার শক্তি থাকে ? স্থূল সাকার-পূজকের অন্তরে কি সূক্ষ্ম নিরাকার ভাব আসে ? সে স্থূল বস্তুই দেখে, তাহার নয়নে সেই স্থূল মূর্ত্তি—সেই হাত-পা-নাক-কাণ, সেই লক্-লক্ লম্বা জিহ্বা নাচিয়া বেড়ায়। ফলে সাকার উপাসনা যে কিছুই নয়,—ইহা অসার ও অজ্ঞানতার কাজ, তাহা হিন্দু-শাস্ত্রেও উক্ত হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

"মৃৎশিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তানীশ্বর বুদ্ধয়ঃ,
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে।"

যে সব মূর্খ মাটী, পাথর, ধাতু-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ঈশ্বর বোধে পূজা করে, তাহারা তপস্যা করিয়া কেবল ক্লেশ পায়, পরম শান্তি পায় না। অষ্টাবক্র সংহিতায় আছে,—

"সাকারমনৃতম্ বিদ্ধি, নিরাকারন্তু নিশ্চলম্,
এতৎ তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভব সম্ভবঃ।"

সাকার মিথ্যা জান, নিরাকার ব্রহ্মকে নিত্য জ্ঞান কর, এই তত্ত্বোপদেশে পুনঃ সংসারে সম্ভব হয় না।

"কৃত্বা মূর্ত্তি পরিজ্ঞানং চেতনস্থ ন কিং কুরু,
নির্ব্বেদ সমতা যুক্ত্যা যস্তারয়ন্তি সংসৃতেঃ।"

যিনি বৈরাগ্য ও সমতার যোগে সংসার হইতে নিস্তার করেন, সেই চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধর্ম্ম-ক্রিয়া করিও না।

"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্ণ্যাঞ্চেৎ মোক্ষসাধনী,
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা।"

মন-গড়া মূর্ত্তি যদি মানবের মুক্তিদায়িনী হয়, তবে লোকে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যেও তো রাজা বলিয়া গণ্য হইতে পারে?

আর কত দেখাইব? প্রতিমা-পূজা যে অসার এবং নিরাকার উপসনাই যে সার ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, হিন্দু-শাস্ত্রের বহু স্থানে সে উল্লেখ আছে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সবই জানেন, আমার বলা বাহুল্য মাত্র। তাই আপনাকে বিনয়ের সহিত নিবেদন করিতেছি, যাহা উপনিষদ বলিতেছেন,—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহর্ম্মনোমতং,
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

মনে যাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে মনন-শক্তি দিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম,—তিনিই অদ্বিতীয় খোদা-তা'লা,—তাঁহাকেই জান। জড়-পদার্থের উপাসনা ব্রহ্মের উপাসনা নহে।"

সোমেশ্বর আচার্য্য ইহা বলিয়া নীরব হইলেন। তাঁহার মুখে এই শাস্ত্র-ব্যাখ্যান শুনিয়া, উচ্চারণ-ভঙ্গী ও বলিবার কায়দা দেখিয়া মিশ্র ঠাকুর অবাক্ হইলেন,—তাঁহার মুখে আর বাক্য সরিল না, এক দৃষ্টে শর্ম্মার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মনে মনে ভাবিলেন,—"একি ! মুসলমানের মুখে হিন্দু-শাস্ত্রের এমন মধুর ব্যাখ্যা ! হিন্দুর এ গূঢ় কথা মুসলমান কোথায় পাইল ? কেমনে শিখিল ? কে তারে এ কথা শিখাইল ? কিন্তু ইহা তো অবিশ্বাস করিবার—'না' বলিবার যো নাই ! এ শাস্ত্র-কথা তো এড়াইতে পারিব না ! ইহার বিরুদ্ধে একটী কথাও বলা চলে না। আমার স্পর্দ্ধা, আমার গর্ব্ব আজ চূর্ণ হইল। আর কি বলিয়া কথা বলিব ? কথা কহিবার খাঁই তো খুঁজিয়া পাইতেছি না ! মাথা-মুণ্ডু বলিবই বা কি ? এরা আমার লাঠিতেই আমার মাথা ভাঙ্গিল ! বৃথা আমার এ সব শাস্ত্র-গ্রন্থ আনা—বৃথা আমার পাণ্ডিত্যের অভিমান !"

মিশ্র ঠাকুরকে এইরূপ ভাবনা-বিহ্বল ও নিস্পন্দ দেখিয়া গাজী সাহেব বলিলেন,—"ঠাকুর ! নীরব কেন ? আর কিছু ব'ল্তে চান কি ?"

"না—আমার আর ব'লবার কিছু নেই। যখন আমারই শাস্ত্র দিয়ে আমাকে জয় ক'রলেন, তখন আর বলিব কি ? আপনাদের উক্তি 'আমার শাস্ত্র-বাক্য নয়', একথা যদি না ব'লতে পারি, তবে আর বাক্য-ব্যয়ে লাভ কি ? ইহাই আমি নীরবে ভাব্‌চি। ভাব্‌চি, হিন্দু কোন্ ধাঁদায় প'ড়ে মিথ্যা সাকার উপাসনায় মত্ত হইল ? কেন হিন্দু অসারে মজিল ? শ্রুতি বলেন,—

"অস্থূলমনণ্ব হ্রস্বমদীর্ঘং"

ঈশ্বর স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন—তিনি স্থূল-সূক্ষ্মাদি তাবত আকার হইতে নির্লিপ্ত। তবে হিন্দু

এ শাস্ত্র-কথা না মানিয়া নানা ঢঙের, নানা রঙের মূর্ত্তির উপাসক কেন হইল? শ্রুতির শাসন হিন্দু কেন ভুলিল? আমি আগেই ব'লেছি, আর এখনো ব'ল্‌ছি—আপনাদের ধর্ম্ম সদ্ধর্ম্ম—ইস্‌লাম-ধর্ম্মে আর বৈদিক ধর্ম্মে তফাত নাই। তবে তফাত যা কিছু আচার-অনুষ্ঠানে। শুনেছি, আপনারা গো-মাংসও ভক্ষণ করেন। আহা গো-মাতার হত্যা! এটী মহাপাতক—অতি কদাচার! এই রকমের যে একটু-আধটু দোষ দেখা যায়, সে গুলি ত্যাগ ক'রলেই ইস্‌লামের বিপক্ষে আর বল্‌বার কিছু থাকে না।"

মিশ্র ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া সোমেশ্বর শর্ম্মা মস্তক উন্নত করিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত মহাশয়! আপনি প্রাচীন আর্য্যদের আচার-ব্যভার ভুলিয়াছেন? বলুন দেখি, অতিথির নাম 'গোঘ্ন' কেন হইয়াছিল? মধু-পর্কে গো-হত্যা হইত কি না?

"তৈষ্টা ঊর্দ্ধং অষ্টম্যাং গোঃ"

বেদোক্ত এ-কথার অর্থ কি? জগতে কোন্ জাতি গো-খাদক নয়।"

"থামুন থামুন, আর না, যথেষ্ট হ'য়েছে। আমার ও-কথাটা উল্লেখ করাই অন্যায় হ'য়েছে। ফলে মহাশয়! আপনার শাস্ত্র-জ্ঞান, আপনার পাণ্ডিত্য, আপনার তর্ক-শক্তির তুলনা নাই! আমি আপনার গুণে মুগ্ধ হইছি, আপনার কথায় আমার চৈতন্য হ'য়েছে—আমি চক্ষুদান পেয়েছি। আমি এই বয়সে অনেক পণ্ডিত দেখেছি, শাস্ত্র-বিচারও ঢের ক'রেছি, কিন্তু আপনার ন্যায়

এমন স্মৃতিধর—এমন সদ্বক্তা কখন দেখি নাই। আমি আপনাকে আমার সভক্তি নমস্কার জানিয়ে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রছি। প্রকৃতই কি আপনি মুসলমান ?"

মিশ্র ঠাকুর ইহা বলিয়া নীরব হইলে শর্ম্মা ঠাকুর হাস্যমুখে বলিলেন,—"অবাক্ হইতে পারেন। কিন্তু জান্‌বেন, মুসলমান অতি সুসভ্য জাতি! এ জাতি যেমন ধর্ম্মনিষ্ঠ, বিদ্যা-চর্চ্চাতেও তেমনি দক্ষ। বিদ্যা-শিক্ষার জন্যে, জ্ঞান-লাভের জন্যে অতি দূর দেশেও যেতে আমাদের ধর্ম্ম-গুরুর আদেশ। এখন আমি কে, শুন্‌তে চান ? শুনুন।"—এই কথার পর শর্ম্মা ঠাকুর নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন।

তখন মিশ্র ঠাকুর সবিস্ময়ে বলিলেন,—"ওঃ! আপনি! আপনি সেই মহামতি সোমেশ্বর আচার্য্য ? পাণ্ডুয়া-রাজধানীর বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী সেই দিগ্বিজয়ী মহাতার্কিক পুরুষ! নতুবা শাস্ত্রের এমন গূঢ় তত্ত্ব আর কার মুখে শোভা পায় ? আপনার নামে আমি ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকি, কিন্তু কখন সাক্ষাৎ ঘটে নাই। আজ আপনাকে দেখে আমার নয়ন-মন সার্থক হ'ল! আর্য্য! আমি আপনাকে আবার শত শত বার অভিবাদন ক'রছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'রতে আমার সঙ্কোচ হ'চ্চে;—আ—প—নি——"

"ওঃ বুঝেছি, আমি ? আমি কেন এ ধর্ম্মে ? আমি মোক্ষ-লাভের কামনায় সত্য পথ ও সার ধর্ম্ম লাভের আশায় ইস্‌লামে আত্ম-সমর্পণ ক'রেছি,—একমাত্র ইস্‌লামই মুক্তি দিতে পারে, জেনেছি। ইতিপূর্ব্বে যদিও আমি হিন্দু ছিলাম, কিন্তু দেব-

দেবীর মূর্ত্তি-পূজা কখন করি নাই—ব্যবসার খাতিরে বাহিরে ক'রেছি,—অন্তরে করি নাই।"

" ন তস্য প্রতিমা অস্তি "

এই মুনি-বাক্য সার ভেবে এবং

" ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং "

অন্তরে দৃঢ় জেনে আমি নিরাকার পরমেশ্বরেরই পূজা ক'রে এসেছি। এখন আমার আর সে সমাজ নাই—ব্যবসার খাতিরও নাই; এখন আমি স্বাধীন, প্রকৃত ধর্ম্মামৃত-পানে আমি ধন্য হ'য়েছি, আমার মানব-জন্ম সফল হ'য়েছে। এখন আপনার কথা,—আপনি তো সমস্তই জান্‌ছেন? তবে আর আঁধারে থাকেন কি জন্যে? ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের সেবা করায় কি ফল? আসুন—সত্য পথের পথিক হউন।

"সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং বিসৃজতে প্রজাঃ,

সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ, স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি।"

শর্ম্মা ঠাকুরের এই সব কথা শুনিয়া মিশ্র ঠাকুর গম্ হইয়া রহিলেন,—মুখে কথা নাই, যেন স্থির পাথরের মূর্ত্তি! কেবল তাঁহার নয়ন-প্রান্তে, কি জানি কিসের জন্য দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আমার কথা? আমি আমার কথাই ভাব্‌ছি। কিন্তু শেষ মীমাংসায় পৌঁছিতে পারি নাই। তবে আমার বিশেষ অনুরোধ,—আমার কন্যাটীকে আপনারা যদৃচ্ছা গ্রহণ করুন—কন্যা-দায় থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। কন্যার মনের ভাব পত্রে তো জেনেছেন? সে কাহার অনুরাগিণী, তা তো বুঝেছেন?

সে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে যাক্‌—মনোমত পতির ভার্য্যা হোক; তাতে আমি সুখী। সে শুভ কর্ম্ম এখনি সম্পন্ন হোক।”

তখন শর্ম্মা ঠাকুর গাজী সাহেবকে মিশ্র ঠাকুরের অভিপ্রায় জানাইলেন। গাজী সাহেব কহিলেন,—“আমরা ঠাকুরের কথায় রাজী। কিন্তু আগে সে মেয়েটারে ইস্‌লামে দাখিল করা, তার পরে সাদী।—সে তো কম সময়ের কাজ নয়? আর সাদীর সাজ-সরঞ্জাম গহনা-পোষাক না হ’লে কি সাদী হ’তে পারে? আমার ইচ্ছা,—পরে একটা দিন ঠিক ক’রে, সে কাজ হবে। আজ অধিক রাত হ’য়েছে, আজ আমরা আসি।”

ইহা বলিয়া গাজী সাহেব ও অপর সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। মিশ্র ঠাকুর সকলকে সানন্দে অথচ চিন্তিত চিত্তে বিদায়-অভিবাদন করিয়া দাওয়ায় উঠিলেন।

বাদল দাস্‌ এ পর্য্যন্ত নীরবে তর্ক-বিতর্কই শুনিতেছিল, কথা কহিবার অবসর পায় নাই। এক্ষণে সময় বুঝিয়া বলিল,—“ঠাকুর, এই তোমার হিঁদুর ধর্ম্ম! কাঠ-পাথরের পিত্তিমে-পূজোর ধর্ম্ম! আজ তো গুমর ফাঁক হ’য়ে গেল ঠাকুর? কৈ বিচেরে তো জিৎতে পাল্লে না! তা আর ভাবা-ভাবি কি, ঐ ধর্ম্মই ভাল—ঐ ধর্ম্মেই যাওয়া ভাল! যাতে জীবের উদ্ধার হবে, সেই তো ধর্ম্ম!”

“বাদল! চুপ করো—থামো। তোমার অত উতলা হওয়ার দরকার? যা হয়, দেখ্‌তে পাবে।”

“আর দেখা-দেখি দাদা ঠাকুর! সব তো দেখ্‌লাম?—দেখা-দেখি সব তো হ’য়ে গেল! আর আমি তোমাদের গোলক-

ধাঁদায় প'ড়ে পাপের বোঝা ভারী ক'রচি নে, এ নিশ্চয় জেন দাদা ঠাকুর!" বলিয়া বাদল নিশার আঁধারে ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গমন করিল।

মিশ্র ঠাকুরও ভাবনায় মগ্ন! তিনি ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন,—ব্রাহ্মণী শয্যাশায়িনী, তিনি আড়ালে থাকিয়া তর্ক-কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া নিজের শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িয়া-ছিলেন। অগত্যা যথাস্থানে পুঁথিগুলি রাখিয়া মিশ্র ঠাকুরও শয্যাগত হইলেন।

যখন গাজী সাহেব সদলবলে বসিয়াছিলেন—শাস্ত্রালাপ চলিতেছিল, তখন লীলাবতী বামার স্কন্ধে ভর দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মোস্তফার রূপ-মাধুরী দেখিতেছিল—মোস্তফার অলক্ষ্যে মোস্তফাকে কটাক্ষ-বাণ হানিতেছিল। হৃদয় দুরু দুরু, মন অশান্ত, প্রাণ উদ্বেগপূর্ণ! আশা পূরে না—পিপাসা মিটে না, সহস্র নয়নে দেখিলেও বুঝি তৃপ্তি হয় না! লীলাবতী তখন আত্মহারা হইল, দাঁড়াইয়া—দাঁড়াইয়া—দাঁড়াইয়া আর দাঁড়াইতে পারিল না। পা কাঁপিতে লাগিল, তখন হৃদয়-পটে সে রূপচ্ছবি অঙ্কিত করিয়া লইয়া বামার কাঁধ ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

কিন্তু বামা বড় চতুরা—বড় রসবতী দূতী! ঘন ঘন আসে আর ফিরিয়া গিয়া লীলার কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি অমিয়া ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যায়। কি সে অমিয়া? রসজ্ঞ ভাবুক বিনা কে তা জানে? আমরা কিন্তু পাঠকগণকে তাহার আস্বাদন দিতে সমর্থ হইলাম না। তবে বামা শেষে উচ্চ হাস্য

করিয়া যে কথা বলিয়াছিল, তাহাই পাঠকগণের গোচর করি-তেছি। বামা বলিয়াছিল,—"সই! ফুল ফোট-ফোট-প্রায়, ভোমরা-বঁধু শীগ্‌গীর উড়ে এসে জুড়ে ব'সে মধু পান ক'রবে,—আর ভেবনা।" লীলাবতী ইহাতে কিছুই বলিল না,—বামার কাপড় ধরিয়া টানিয়া তাহাকে নিজের কাছে শয়ন করিতে বলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

দুইটী শুভ কার্য্য

এদিকে দ্রুতগতিতে মস্‌জিদাদির নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছিল। মাল-মশলা, লোক-জনের অভাব ছিল না। ভগ্ন বৌদ্ধ-মঠ ও পতিত হিন্দু দেব-মন্দিরের ইট-পাথর দ্বারা ইমারতী কার্য্যে দক্ষ রোকনউদ্দীন রোকন খানের যত্নে ও উৎসাহে দুই মাসাধিক কালের মধ্যে মস্‌জিদ, মিনার, মোসাফের-খানা সমস্তই প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

মসজিদটী বৃহৎ—৬০ হাত লম্বা, ২৬ হাত চওড়া, উপরে দশটী সুদৃশ্য বৃহৎ গুম্বজ।* গুম্বজসমূহ মোটা মোটা থামের উপরে খিলানে দণ্ডায়মান। সম্মুখ-ভাগ সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী-শোভিত, চারি কোণে চারিটী থাম সকলের চেয়ে বড়। মসজিদের সম্মুখ হইতে নদীর কিনারা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা বড় বড় কালো পাথরে গাঁথা, ধর্ম্মপ্রাণ উপাসকগণ নদীতে গিয়া 'অজু' করিয়া আসিবে এবং নদীর ধারে গিয়া ভ্রমণ করিবে বলিয়াই ইহার নির্ম্মাণ। মস্‌জিদের চারিদিকে বহু দূর লইয়া বড় বড় পাথরের প্রচীর দিয়া ঘেরা। (১) ঘেরার মধ্যে গাজী

---

* শত শত বৎসর-ব্যাপী কালের ধ্বংস-প্রহার সহিয়াও অদ্যাপি ছয়টী গুম্বজ বর্ত্তমান আছে। বারান্দার তিনটী এবং ভিতরের ঘরের একটী গুম্বজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্য কোঠা-বালাখানাও নষ্ট হইয়াছে।

(১) প্রাচীরাদির পাথরে নানা হিন্দু দেব-মূর্ত্তি এবং শ্রীরামেণ রাবণ বধঃ, খরত্রি শিরমোর্ব্বধঃ ইত্যাদি নক্সা খোদিত দেখিয়া হিন্দু লেখকগণ অনুমানে বলেন,—জাফর খান হিন্দুর বহু দেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু-বৌদ্ধ-সংঘর্ষণে ভারতের অধিকাংশ দেব-মন্দির ও

সাহেবের 'হুজ্‌রা' (সাধন-গৃহ), বাবুর্চি-খানা ; আরও অনেক গুলি ঘর। এই সব ঘর গাজী সাহেবের বিশেষ বিশেষ সঙ্গী এবং মোসাফেরদের বাসের জন্যই নির্ম্মিত হইল। প্রাচীরের বাহিরেও পৃথক পৃথকভাবে কয়েকটী গৃহ ও তাহার কিছু দূরে চাকর-ন্যকরদের জন্য কতিপয় ছোট আকারের ঘর নির্ম্মিত হইল।

মসজিদের সম্মুখভাগে খিলানের উপরে এক খানি গাঢ় কৃষ্ণ কষ্টি-পাথরে আরবী অক্ষরে মসজিদ-নির্ম্মাতার নাম সহ আপনার দীনতা, বিনয়-নম্রতা ও আল্লার দরবারে প্রার্থনার কথা খোদিত করিয়া রক্ষিত হইয়াছে। উহার সার মর্ম্ম এই,—"পরম দয়ালু দাতা আল্লার নামে আরম্ভ। আল্লারই প্রশংসা। বিশ্বাসীদের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আল্লাই দাতা, দয়ালু, প্রার্থনা-পূর্ণকারী। তাঁহারই কৃপায় সিংহ-বিক্রম দীন জাফর খান গাজী কর্ত্তৃক ইস্‌লাম-প্রচার ও আল্লার পতাকা উন্নত করিবার জন্য ওমরাহ্‌ রোকনউদ্দীন্‌ রোকন খান এব্‌নে আলাউদ্দীন সইতীর তত্ত্বাবধানে ইহা নির্ম্মিত হইল। আমিন—রব্বেল আলামিন। যে কেহ এই মসজিদ সংস্কার করিবেন, খোদা-তা'লার রহমৎ পাইবেন, আর খোদা না করুন, যদি কেহ ইহার বে-ইজ্জৎ করে, আল্লা তাহাকে বে-ইজ্জৎ করিবেন।"

বৌদ্ধ মঠ ভগ্ন—চূর্ণ—ভূমিসাৎ হইয়াছিল, একথা একবার ভুলিয়াও ভাবেন না এবং সেই বিক্ষিপ্ত ইট-পাথর লইয়া মুসলমানগণ মসজিদাদি নির্ম্মাণ করাইতে পারেন বা করাইয়াছিলেন, ইহাও মনে করেন না, বড়ই দুঃখের বিষয়। তাই বলিয়া যে জাফর খান বা অন্য কোন মোস্‌লেম ধর্ম্মবীর মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ বানান নাই, আমি তাহা বলিতেছি না।

মসজিদের অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে আর এক খণ্ড জমি, বেলে পাথরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহা কবরস্থানের জন্য রক্ষিত। মুসলমান বাদশাহ্, দরবেশ ও আমীর-ওমরাহ্গণ নিজেদের কাফনের (শবাচ্ছদনী কাপড়ের) সংস্থান ও কবর অগ্রেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন। এখানেও সে প্রথা ভঙ্গ হইবে কেন? স্থানটী পথি-পার্শ্ববর্ত্তী এবং অতি সুন্দর।

আজ এই মসজিদের আঙ্গিনায় ভারী ধুম-ধাম—বড় ঘটা। আজ শুভ শুক্রবার—আজ মস্জিদের প্রতিষ্ঠার দিন। পাণ্ডুয়া হইতে ধর্ম্মাত্ম দরবেশ শাহ্ সফিউদ্দীন সদলবলে আসিয়া বার দিয়াছেন। অতিথি-অভ্যাগত, কাঙ্গাল-মিস্কীন অনেক জুটিয়াছে।—আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে, ভিতরে স্থান না থাকায় প্রাচীরের বাহিরেও বহু লোক দাঁড়াইয়া উৎসব দেখিতেছে। অনেক কৌতুহলী যুবক ও বালক গাছের উপরে বসিয়াও ইস্লামের সাত্ত্বিক কাজ দর্শন করিতেছেন।

আজ ত্রিবেণীর নব-দীক্ষিত ও নবাগত মুসলমানগণের আনন্দের সীমা নাই—সুখের পার নাই। আজ তাঁহারা কেহই ক্রিয়াহীন—অলস নহেন। কেহ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া দুঃখী-মিস্কীনদিগকে চাউল বিলি করিতেছেন, কেহ পয়সা দিতেছেন, কেহ রোগীদের 'তাবিজ' ও পানি-পড়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। ওদিকে বাবুর্চ্চি-খানায় সোর-গোল পড়িয়া গিয়াছে। চুল্লীর উপরে সারি-সারি বড় বড় দেগিচা সজ্জিত—আগুন সতেজে হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। গোশ্ত্-পোলাও দগ্দগ্ করিয়া পাকিতেছে! খোশ-বুতে চারিদিক্ মাত্ করিয়া দিয়াছে। কেহ

কেহ চুল্লীতে কাষ্ঠ জোগাইতেছে, কেহ পোলাও দেখিতেছে, কেহ বা ঝটিতি সরপোষ সরাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে 'কাব্‌গীর' দ্বারা গোশ্‌ত্‌ নাড়িতেছে। অপর আয়োজনেও অনেকে ব্যস্ত রহিয়াছে; সকলেরই মুখ প্রীতিপূর্ণ, দেহ আনন্দমাখা, অন্তর পবিত্রতায় ভরা।

ধর্ম্মবীর শাহ্‌ সফিউদ্দীনের অন্তরে আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছে, তিনি সদলবলে গাজী সাহেবের সঙ্গে আসিয়া মিনারের ভিতর-বাহির এবং অন্য ঘরগুলি ও চারিদিকের প্রাচীর ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন,—সমস্তই সুন্দর ও সৌষ্ঠবময় হইয়াছে। তিনি মনে মনে রোকনউদ্দীন রোকন খানের ইমারতী-জ্ঞানের প্রশংসা করিলেন।

আহারাদির পর যথাসময়ে জুম্মার নামাজ সাঙ্গ হইল—দেবদেবীর-উপাসক-সমাচ্ছন্ন ত্রিবেণীর বক্ষে নব-নির্ম্মিত পবিত্র মস্‌জিদে নিরাকার আল্লার উপাসনা এই প্রথম হইল।—ইমাম ('আচার্য্য) হইলেন পাণ্ডুয়া-বিজয়ী শাহ্‌ সফিউদ্দীন। পুণ্যপুরুষ পুণ্য কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন,—ত্রিবেণী ধন্য—পবিত্র হইল। তাঁহার উচ্চ কণ্ঠের সুমধুর কোরাণ-পাঠ শ্রবণে সকলে আনন্দে অশ্রু বহাইল—মসজিদ গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল। তাঁহার 'ওয়াজ-নসিহত্‌' (উপদেশ-বাণী) সকলের কর্ণে সুধাবৃষ্টি করিল।

নামাজ বাদ মসজিদ-চত্বরে মজলিস্‌ বসিল। মাঝখানে শাহ্‌ সফিউদ্দীন উপবিষ্ট; তাঁহার তেজোপূর্ণ দীর্ঘ দেহ ও প্রশান্ত মুখশ্রী দেখিলে অন্তরে ভক্তি-স্রোত আপনিই উছলিয়া উঠে।

শাহ্ সফির পার্শ্বে শাহ্ সালার গাজী, মখ্দুম কেয়ামউদ্দীন, সৈয়দ আশরাফ খান গাজী, বাহ্রাম সাক্কা প্রভৃতি সঙ্গিগণ এবং সম্মুখে শাহ্ জাফর খান গাজী, রোকনউদ্দীন রোকন খান, সোমেশ্বর শর্ম্মা, মুফ্তী সাহেব, মোস্তফা খান বোখারী আর সেই নবদীক্ষিত মোস্লেমগণ বসিয়াছেন সভাস্থল মুখরিত করিয়া "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" "আল্লাহো আকবর, আল্লাহো আকবর", (আল্লা ছাড়া উপাস্য নাই, আল্লাই মহান, আল্লাই উন্নত) এই মহান্ ধ্বনি ঘন ঘন উঠিতেছে। কেহ মধুর স্বরে কোরান-শরীফ আবৃত্তি করিতেছেন—কেহ সম্মুখে রাখিয়া পাঠ করিতেছেন। শাহ্ সফিউদ্দীন এবং অপর সকলে সেই পবিত্র গাথা ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে শুনিতেছেন। আহা শাহ্ সফিউদ্দীনের কি উদার—মহান—শান্ত—পবিত্র ভাব! এই পাপ-তাপময় ধরাতলে এই পুণ্য-পুরুষদের এহেন সম্মিলন,—ইহা খোদা-তা'লার দয়া ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। হিন্দু দর্শকগণ মুগ্ধ নেত্রে এ ভাব দর্শনে ইস্লামের অশেষ গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগি-লেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শাহ্ সফিউদ্দীন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"জাফর! আজ তুমি ধন্য হ'লে। আল্লাহ্-তা'লা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রেছেন। আল্লা তোমার উপরে খুব মেহেরবান। আমি তোমার এই মস্জিদ—মিনার—কোঠা-বালা খানা দেখে বড়ই খুশী হইচি। তুমি আল্লার দর্গায় খুব সওয়াব (পুণ্য) পাবে। তোমার এই কীর্ত্তি তা-কেয়ামত (প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত) বজায় থাকবে।"

গাজী সাহেব ইহা শুনিয়া হাত তুলিয়া তস্লিম দিলেন এবং

নম্রভাবে বলিলেন,—"হুজুর ! এ সব যা হ'য়েছে, সব-ই আল্লার দয়া আর আপনার দোওয়ার ফল ! আপনার কদমের জোরেই আমার সাহস—আমার হেম্মত। তবে এ মসজিদ-মিনার অতি ছোট—অতি সামান্য ! হুজুরের পাণ্ডুয়া-মসজিদের তুলনায় আকাশ-পাতাল ফারাক !"

"না জাফর ! তা ব'লো না—মসজিদ সব-ই কদরে সমান, আকারে ছোট-বড়তে আসে যায় না। আমি ৬৬ গুম্বজের ২২ দুয়ারী খুব বড় মসজিদ আর মিনার, রওজা, দীঘি-পুকুর বানিয়েছি বটে, কিন্তু এমন পসন্দসই—এমন খুবসুরত জায়গাটী আমি পাইনি। তোমার জায়গাটী বড় সুন্দর—বড় কায়দা-সই। তোমার আশে-পাশে খোলা ময়দান—সামনে মস্ত দরিয়া,—তুচ্ছ আমার সে দীঘি-পুকুর ! এ সব দেখ্‌লে মনে খোদার এশ্‌ক্ (প্রেম) আপনিই জেগে ওঠে ! এ সুখের শান-শওকত খোদাই তোমারে দিয়েছেন। খোদা আরও তোমার বোলন্দ-নসিব করুন।"

"হুজুরের দোওয়া ! হুজুরের ভরসাতেই আমার ভরসা। হুজুরের শুভাগমনে আজ আমি কৃতার্থ হইছি—এই নব মোসলেমগণ ধন্য হ'য়েছে। হুজুরের নসিহতে (ধর্ম্ম-উপদেশে) এদের খুব ফায়দা হ'য়েছে। হুজুর মাঝে মাঝে তশ্‌রীফ আনেন (পদার্পণ করেন), ইহাই আমাদের আরজ।"

"তা আর ব'ল্‌তে হবে না, জাফর ! আমি ফোরসৎ পেলেই এখানে আস্‌ব।"

মাতুল-ভাগিনেয় এইরূপ কথাবার্ত্তায় বেলা প্রায় শেষ করি-

লেন ; সান্ধ্য নামাজের সময় উপস্থিত। সকলে 'অজু' করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। এদিকে বেলোয়ারী বেল-ফানুশে খাদেমরা মোম-বাতি জ্বালাইয়া দিল। তখন উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় মসজিদ আজব শোভা বিকাশ করিতে লাগিল। শাহ্ সফিউদ্দীন অগ্রবর্ত্তী হইয়া নামাজ নির্ব্বাহ করিলেন।

নামাজের পর প্রায় দুই ঘণ্টা মুদিত নয়নে তসবীহ্-জপ— খোদা-তালার ধ্যানে নিমগন! তখনকার সে ভাব—সে দৃশ্য আরও মনোহারী, আরও হৃদয়-মনোরঞ্জন! তখন যেন বোধ হইল, স্বর্গের পূর্ণ শান্তি নামিয়া আসিয়া সেখানে বিরাজ করিতেছিল।

ধ্যান ভঙ্গ হইলে গাজী সাহেব শাহ্ সফিউদ্দীনকে কহিলেন— "হুজুর! আপনাকে যে কথা বলেছিলাম, এখন সেই শুভ কর্ম্মটী বাকী—সেই হিন্দুর কুমারীকে ইসলামে দাখিল করা, আর তার সাথে মোস্তফা খানের সাদী!"

শাহ্ সফীউদ্দীন শ্রবণমাত্র বলিলেন,—"ওঃ, সে কাজ তো আগে। শুভ সাদী আর একটী কাফেরকে খোদার পথে আনা, এ দুই-ই নেক কাজ! ইহাতে বহুত সওয়াব আছে। তা সে কাম এখানে হবে, না কোথাও যেতে হবে?"

"হুজুর! একটু কষ্ট ক'রে যেতে হবে,—সে বহুত তফাত নয়, সেখানকার লোকও এখানে হাজির আছে।"

"তফাত হ'লেও হানি নাই;—খোদার কামে নিকট-দূর ভাব্‌লে কি চলে? নইলে কোথায় দিল্লী আর কোথায় বাংলা মুলুক! কত জঙ্গল, পাহাড়, দরিয়া, ময়দান পার হ'য়ে কত কষ্ট

পেয়ে আমরা কি আসতাম? তা নেক কামে আর দেরী কেন? কোথায় যেতে হবে? ওঠ।" বলিয়া শাহ্ সফিউদ্দীন গাত্রোত্থান করিলেন।

গাজী সাহেব বলিলেন,—"সকলের দরকার নেই। সালার-গাজী, মুফ্‌তী সাহেব, মখ্‌দুম কেয়ামুদ্দীন, সর্দ্দার সাহেব, সোমেশ্বর শর্ম্মা আর খাজা আবদাল আলি এই কয় জন গেলেই হবে।" সকলে রওনা হইলেন—দুই জন আলোকধারী নওকর সঙ্গে চলিল, মোস্তফা খান বোখারী মধ্যস্থলে চলিলেন। বিচক্ষণ গাজী সাহেব সাদীর সাজ-সরঞ্জাম ও বরের পোষাক, দেশের প্রথানুসারে ক'নের সাড়ী, কোর্ত্তা, ওড়না, জুতা, খান কতক গহনা, আতর-গোলাপ প্রভৃতি মৌজুদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ সব এক জন নব-দীক্ষিত মুসলমানের হাতে দিলেন।

অগ্রে এক জন আলোকধারী এবং তৎসঙ্গে বাদল দাস পথ দেখাইয়া চলিল। কথোপকথন করিতে করিতে ধীরে ধীরে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সকলে মিশ্র ঠাকুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

আজ মিশ্র ঠাকুর আপনার দাওয়াতেই সকলের স্থান করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বিধা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বাড়ীতে মুসলমানের গতি-বিধি, ধর্ম্ম-বিচার ও মিশ্র ঠাকুরের মনের ভাব রাষ্ট্র হওয়ায় অনেকে তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন—তাঁহার কন্যার বিবাহের জোগাড় করিয়া দিবেন, এ আশাও খুব দিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুর সে কথায় আর কর্ণপাত করেন নাই।

কেহ কেহ শেষে তাঁহার কন্যাকে কাড়িয়া আনিয়া আটকাইয়া রাখারও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে মুসলমান-স্পৃষ্টা নারীকে স্থান দেওয়ায় জাতিচ্যুত হইতে হয়, বা অন্য কোন বিপদ ঘটে, এই ভয়ে সে কাজে কেহ অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই।

সোমেশ্বর শর্ম্মা অগ্রবর্ত্তী হইয়া মিশ্র ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন। মিশ্র ঠাকুর প্রত্যভিবাদন করিয়া হস্ত তুলিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন,—"আসতে আজ্ঞা হউক—আসুন।" তখন সকলে দাওয়ায় উঠিয়া বসিলেন। কিছু ক্ষণ পরে সোমেশ্বর শর্ম্মা মিশ্র ঠাকুরকে বলিলেন,—"পণ্ডিত মহাশয়! ইস্‌লামই যে সত্য ধর্ম্ম, এ আপনি বেশ বুঝেছেন, এখন আপনার অভিপ্রায় কি?"

মিশ্র ঠাকুর সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না, ক্ষণ কাল স্তব্ধ থাকিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন,—"সব-ই বুঝেছি, সব-ই জানি, কিন্তু আমাকে আর পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে ব'ল্‌বেন না— আমি নিজ ধর্ম্মেই থাকি। তবে আমার কন্যাটীরে আপনারা ইস্‌লামে দীক্ষিত করুন—তাকে গ্রহণ করুন, আমি দারুণ কন্যা-দায় হ'তে পরিত্রাণ পাই। ফলে ইহা নিশ্চয় জান্‌বেন,—আমি যে কয়টা দিন বাঁচ্‌ব, নিরাকার ব্রহ্মেরই উপাসনা ক'রব—প্রতিমা-পূজা আর আমার দ্বারা হবে না।"

সোমেশ্বর শর্ম্মা মিশ্র ঠাকুরের মনের ভাব শাহ্‌ সফিউদ্দীন ও অন্য সকলকে জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা কহিলেন,—"উত্তম! তবে আর বিলম্বে কাজ কি? তাঁর কন্যাকে এই দরজার কাছে আসতে বলুন।"

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ঘরের ভিতর তখ্‌ত্‌পোষে বসিয়াছিলেন। বামাও সেখানে ছিল। তিনি বামার সঙ্গে উঠিয়া গিয়া কন্যাকে আনিয়া দরজার কাছে বসাইয়া দিলেন।

লীলাবতী অবগুণ্ঠনবতী—নতমুখী। তাহার পরণে এক খানি শুভ্র সুন্দর চিক্কণ সাড়ী—তাহার রূপ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। বামাও ঘোমটা দিয়া তাহার পাশে ঘেঁষিয়া বসিল! উভয়ের বুক দুরু দুরু, কিন্তু মন আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল।

মুফ্‌তী সাহেব লীলাবতীকে যথাবিধি 'তওবা' করাইয়া ইস্‌লামের মূল মন্ত্র পড়াইলেন—ইস্‌লামের ধারা বুঝাইয়া দিলেন। লীলাবতী মুসলমান হইল—লীলাবতী 'বিবি লায়লন্নেসা' নাম পাইল। শেষে মুফ্‌তী সাহেব ভক্তি-গদ-গদ-কণ্ঠে হাত উঠাইয়া আল্লার দর্গায় মোনাজাত করিলেন, সকলে হাত তুলিয়া 'আমিন আমিন' বলিতে লাগিলেন। মোনাজাত সাঙ্গ হইল, অমনি স্বয়ং গাজী সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া সকলের গায়ে গোলাব ছিটাইয়া দিলেন,—আতর-দানে আতর সম্মুখে ধরিলেন। সকলে আহ্লাদে হর্ষ-ধ্বনি করিলেন।

অতঃপর শুভ বিবাহের কার্য্য। সোমেশ্বর শর্ম্মা মিশ্র ঠাকুরের হাতে শাড়ী, কোর্ত্তা, ওড়না, রুমাল, গহনা, আতর প্রভৃতি দিয়া বলিলেন,—"এগুলি আপনার কন্যাকে ঘরের ভিতর গিয়া পরিয়া আসিয়া আবার এখানে বসিতে বলুন।" জুতা জোড়াটা তাঁহার হাতে দেওয়া সঙ্গত নয় বলিয়া শর্ম্মা নিজে হাত বাড়াইয়া দুয়ারের কাছে রাখিয়া দিলেন।

তখন মিশ্র ঠাকুর বামার হাতে সেই সব দিয়া ইঙ্গিত

করিলেন। বামা লীলাবতীকে—উহুঁ আর লীলাবতী বলি কেন? বিবি লায়লন্নেসাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া কাপড়, কোর্ত্তা, গহনা, তদুপরি ওড়না পরাইয়া দিল—লায়লন্নেসাকে বিয়ের ক'নে সাজাইল। সুগন্ধি আতরও লাগাইল—কোমলাঙ্গ সুবাস-ভরা হইল। তখন লায়লন্নেসার রূপ আরো ফুটিয়া উঠিল—মোহিনী ভুবনমোহিনী হইল।

বামা কাপড় পরাইতে পরাইতে হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"সই, মনের কথা কই, আশা তো মিটিল সই?"

লায়লন্নেসা কথা কহিল না, মুচ্‌কি মৃদু হাসিয়া বামার উপরে কটাক্ষপাত করিল। পরে রুমাল খানি হাতে লইয়া পর-কাটা পরীর মত মৃদুপদে আসিয়া বামার সঙ্গে নম্রভাবে বসিল।

এদিকে মোস্তফা খান বোখাবা নওশা-বেশে বসিয়াছেন। গাজী সাহেব স্বহস্তে তাঁহাকে পোষাক পরাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারও মনোহর রূপ আরও মনোহর হইয়াছে।

বিবাহ-কার্য্য আরম্ভ হইল। উকীল হইলেন স্বয়ং গাজী সাহেব, স্বাক্ষী শর্ম্মা আর সর্দ্দার সাহেব। মোল্লার কাজ করিলেন মুফ্‌তী সাহেব। বিবাহ পড়ান হইয়া গেলে শরা-শরিয়ৎ-সঙ্গত সাদীর শর্ত্তগুলি নব দম্পতিকে শোনান হইল। পরে আবার আতর-গোলাব বিতরণ হইল। তৎপরে আবার মোনা-জাতের পর বিবাহের কাজ সাঙ্গ হইয়া গেল।

অবশেষে মিশ্র ঠাকুর বাষ্পাকুল-লোচনে গদ-গদকণ্ঠে মোস্তফাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাবা মোস্তফা! আমার

সর্ব্বস্ব ধন—আমার প্রাণাধিকা কন্যাকে আজ তোমার হাতে সমর্পণ ক'রলাম। এখন এর ভরণ-পোষণ, আব্দার-আহ্লাদের ভার তোমার উপর। তুমি এরে স্নেহের চোখে দেখো—ভালবেস্যো, ত্রুটি হ'লে ক্ষমা ক'রো। আজ আমার ঘর-বাড়ী শূন্য হ'ল—হৃদয় শূন্য হ'ল, আমার সংসারের বাঁধন টুট্‌ল,—আমি স্বচ্ছন্দ হ'লাম।"

বৃদ্ধ আর কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দর-দর-ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। গৃহ-মধ্যে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীও তদবস্থাপন্না, হর্ষ-বিষাদ দুই-ই তাঁহাদের অন্তর আচ্ছন্ন করিল।

সেই রাত্রিতেই নব বধূকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল। পাল্‌কী উপস্থিত, সকলে দাওয়া হইতে নামিয়া তফাতে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণী কন্যাকে পাল্‌কীতে তুলিয়া দিবার জন্য হাত ধরিয়া তুলিলেন, বামাও উঠিল। মিশ্র-কন্যার নয়ন আজ অশ্রু-ভারাবনত, সে অশ্রু মাতৃক্রোড়—মাতৃ-স্নেহ হইতে তফাত যাওয়ার জন্য। বামার চক্ষেও জল আর ধরিতেছে না, তাহার বুক ধড়-ফড় করিয়া উঠিল, প্রাণ উদাস—অস্থির, মুখে ধূলা বাঁটিয়া যাইতে লাগিল। বামা উঠিয়াই কি রকম যেন হইয়া গেল—লজ্জা-শরম তাহার মুখকে আর আটক করিতে পারিল না; সে আকুলকণ্ঠে বলিল,—"সই—সই! চ'ল্‌লে? আমারে ফেলে চ'ল্‌লে সই? আমি তো আর—হা সই——"

আর কথা বাহির হইল না; একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ-স্বর রুদ্ধ হইল। আবার দাওয়ায় পা দিয়াই উতলা হইয়া আবেগভরে বলিল,—"সই,

যাবে—যাবে? একলা যাবে? না তোমারে একলা যেতে দেবো না সই। আমি তোমার সই, আমিও তোমার সাথে যাব। আমি সঙ্গ-ছাড়া হব না। তুমি যে পথে যাবে, যেখানে থাকবে, আমিও সে পথে যাব,—সেখানে থাকব। আমারে সঙ্গে নিয়ে চল, তুমি গেলে আমি প্রাণে বাঁচব না সই!—"

ইহা বলিয়া বামা জোর করিয়া লায়লন্নেসার কাপড় টানিয়া ধরিল।—কি আপদ! এ আবার কি উপসর্গ? এ কি পাগল? সকলে অবাক্ হইয়া ইহা ভাবিতে লাগিল।

সোমেশ্বর শর্ম্মা মিশ্র ঠাকুরকে বলিলেন,—"এ যুবতী কে? এ ওরূপ ক'রছে কেন?"

মিশ্র ঠাকুর বলিলেন—"ও আমার কন্যার বাল্য সখী—দু'টীতে বড় ভাব—গলায় গলায় ভালবাসা। তাই ও কষ্টে ওরূপ ক'রছে।"

"বটে—বটে!" বলিয়া শর্ম্মা ঠাকুর দাওয়ার নিকটে গিয়া বামাকে কহিলেন,—"হ্যাঁ গো, তুমি কি তোমার সইএর সঙ্গে যেতে চাও? গেলে তো আর আসা ঘটবে না বাছা!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বামার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে উত্তর করিল,—"নাই বা ঘ'টল! আমি সইএর সঙ্গেই থাকব—সই-এর যে গতি, আমারও সেই গতি।"

"তোমার সই হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রেছে—আমাদের ধর্ম্মে এসেছে, তুমি কি ক'রবে?"

বামা বলিল—"আমিও তাই ক'রব?"

"বেশ—বেশ!" বলিয়া শর্ম্মা ঠাকুর ফুল্লমনে সকলকে এ অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন।

বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দরবেশদল যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। দরবেশশ্রেষ্ঠ শাহ্ সফিউদ্দীন বলিলেন,—"বাঃ বাঃ! আল্লার কি মর্জ্জি—

"ও-ইঁ সায়াদৎ বো-জোরে বাজু নেস্ত,
তা নাহ্ বখ্‌শাদ্ খোদায়ে বখ্‌শেন্দাহ্।"

খোদার দয়া না হ'লে কি বাহু-বলে এমন সওয়াবের কাজ সফল হয়?"

মুফ্‌তী সাহেব বলিলেন,—

"চুঁ এনায়েৎ কাদর কাইয়ূম কারদ,
দার কাফে দাউদ আহনে মোম কারদ।"

"আল্লার অনুগ্রহে পয়গম্বর দাউদের হাতে লোহাও মোমের মত হইয়াছিল। এখন জল্‌দী কাম ফয়সালা করা হোক।"

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী মিশ্র ঠাকুরের ইশারায় কন্যা ও বামাকে লইয়া আবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সকলে দাওয়ায় উঠিয়া আবার আসন গ্রহণ করিলেন। বামা হেঁটমুখে ঘোমটা টানিয়া দিয়া দুয়ারে বসিল, পূর্ব্ব নিয়মে সে ইস্‌লামে দীক্ষিতা হইল; কিন্তু তাহাকেও অবিবাহিতা রাখা ঠিক নয় ভাবিয়া সকলে পরামর্শ পূর্ব্বক খাজা আবদুল আলির সহিত বামার সাদী পড়াইয়া দিলেন। আবদুল আলি যুবক এবং সুপুরুষ,—উভয়ে উভয়ের উপযুক্ত। বামা 'বিবি বাহারন্নেসা' হইল।

বাদল দাস এ পর্য্যন্ত একটীও কথা কহে নাই, নীরবে সমস্ত

দরাফ খাঁ গাজী

কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক একটা উদ্বেগের তরঙ্গ তাহার অন্তর আলোড়ন করিতেছিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। বলিল,—"দাদা ঠাকুর! আর না—আর ভ'জবো না তোমার নোড়া-নুড়ী, আর যাব না ঠাকুর-বাড়ী,—আমিও এই পথের পথিক হ'লাম, এই আমার শেষ পেরনাম। সত্য যখন মিলেছে, তখন আর অসত্যে ম'জে থাকব কেন?" দরবেশ-দিগের পানে চাহিয়া বলিল,—"বিধেতা আপনাদের এই ত্রিবেণীতে জীবের উদ্ধার ক'রতে পাঠিয়েছেন, এ অধমকেও উদ্ধার করুন।"

বাদল দাসের কথায় মুসলমানগণের অন্তরে খুশীর ফোয়ারা খেলিতে লাগিল। তাঁহারা খোদা-তা'লার উদ্দেশে মস্তক নত করিলেন। পরে বাদল যথানিয়মে ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। অনন্তর সেই শুভ রজনীতে এক পাল্‌কীতে দুইটী নব বধূ—দুই সই—প্রাণের সই,—বিবি নায়রন্নেসা আর বাহারন্নেসাকে লইয়া শাহ্‌ সফিউদ্দীন, গাজী জাফর খান প্রভৃতি প্রস্থান করিলেন। বাদল দাসও তাঁহাদের অনুগমন করিল। মিশ্র ঠাকুরের বাড়ী খানি প্রকৃতই শূন্য—উদাস—শ্রীভ্রষ্ট হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আগুন জ্বলিল

গাজী সাহেবের মাহাত্ম্য, সুনাম, প্রসার-প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দিন দিন হিন্দু নরনারীগণ স্বেচ্ছায় আসিয়া ইস্‌লাম গ্রহণে ত্রিবেণীর দরবেশগণের দলপুষ্টি করিতে লাগিল। মস্‌জিদের আশে-পাশে মুসলমানের এক খানি গ্রাম বসিয়া গেল। রাত্রি দিনে পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচ বার "আল্লাহো আকবর"-ধ্বনি ত্রিবেণী নগরীর প্রাসাদে, কুটীরে, প্রান্তরে, কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নিশাবসানে—প্রত্যূষে সে মধুর ধ্বনি নগরবাসীদের কাণে জাগরণের সাড়া দিতে লাগিল। নিয়মিত নামাজ, কোরান-শরীফ পাঠ, ঈদ-বক্‌রীদ, শবে-বরাত, ফাতেহায়-দো-আজ-দাহম প্রভৃতি পার-পার্ব্বণের উৎসব ধুম-ধামে চলিতে লাগিল। মুসলমানের এই অশেষ উন্নতি—হিন্দুর ক্ষয়, ইস্‌লামের জয় দর্শনে গোঁড়া হিন্দুগণ বিষম বিদ্বেষে জ্বলিয়া উঠিল—গোপনে মুসলমানের উচ্ছেদ সাধনের পরামর্শ চলিল।

"বামুনের মেয়েরে মুসলমান ক'রেছে, ঈদ-পার্ব্বণে হিন্দুর গো-মাতা হত্যা ক'রে মাংস খেয়েছে!" এ কথা হিন্দুর মুখে মুখে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িল—চারিদিকে হুলস্থুল বাধিয়া উঠিল। যে হিন্দু শুনিল, সেই শিহরিয়া উঠিল, সেই দাঁতে জিভ কাটিয়া 'রাম—রাম' বলিয়া কাণে হাত দিল! কিন্তু কেহ বুঝিল না যে, মুসলমানেরা ত্রিবেণীতে আসিয়া কিছুই অন্যায়

করেন নাই—জোর করিয়া কাহাকেও মুসলমান করেন নাই, মুসলমানের ধর্ম্ম জোরের ধর্ম্ম নহে।—তাহারা একবার ভ্রমেও ভাবিল না যে, বলপূর্ব্বক কখনও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় না। মুসলমান নিজের শাস্ত্রানুসারেই গো-কোরবাণী করিয়াছে, তাহাতে অন্যের অধর্ম্ম কি আছে? ফলতঃ হিংসা-বশে অনেক হিন্দুই দরবেশগণের বিপক্ষে দাঁড়াইল। কিন্তু অনেকে আবার গাজী সাহেবের মাহাত্ম্য মনে করিয়া নীরব রহিল।

প্রবল শত্রু হইলেন মহানাদ, দ্বার-বাসিনী, ভূদিয়া, ব্রাহ্মণ-নগর প্রভৃতি স্থানের রাজারা। ইহাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-নগরের রাজা মুকুট রায় প্রধান। মুকুট রায়ের বল-বিক্রমের সীমা ছিল না; তাঁহার রাজ্য যেমন বড়, সৈন্য-সামন্তও তেমনি অগণন ছিল। এই বলের সহিত অন্য রাজ-শক্তি যোগ দেওয়ায় মুকুট রায় হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য বুক ফুলাইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া মুসলমানগণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। *

এদিকে মুসলমানগণ গণনায় নিতান্ত অল্প, কিন্তু তাঁহারা অসাধারণ তেজোবীর্য্যে ভরা, সাহসে দুর্জ্জয়, যুদ্ধে জবরদস্ত! প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তবু রণ-ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবার পাত্র নহেন।

শত্রু-সৈন্য সম্মুখে দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ জাফর খান গাজী সকলকে

---

* "তিনি (মুকুট রায়) হিন্দু প্রজার হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক স্থলেই জয়লাভ করিয়াছিলেন।"—অম্বিকাচরণ গুপ্ত—'হুগলী' প্রথমার্দ্ধ দ্রষ্টব্য।

সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভাই মুসলমানগণ! আজ বিষম সঙ্কট আমাদের সামনে উপস্থিত। ইস্‌লামের খারাবীর জন্যে—আমাদের নিপাতের জন্যে দুষ্‌মনগণ পাঁচ হাতিয়ার নিয়ে খাড়া হ'য়েছে। ঐ শোন তাদের রণ-কোলাহল, ঐ শোন তাদের জয়-ডঙ্কার ঘন ঘন আওয়াজ, ঐ শোন তাদের উচ্চ তূর্য্য-ধ্বনি। কিন্তু ভাই সকল! ভয় নাই—ভাবনা নাই। তারা গণনায় অনেক, আর আমরা অল্প! তাতেই বা ডর-ভয় কি? মুসলমান ভয় কারে বলে জানে না-ভয় শব্দ মুসলমানের মুখে শোভা পায় না। যারা ভীরু, যারা হীনবল—কাপুরুষ, যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারাই তুচ্ছ এ বিপদে কাঁপে, ভয়ে মরণের আগেই মরে। মুসলমান জানে, যুদ্ধে শহীদ হ'লে অনন্ত আরাম—বে-হেসাব বেহেশ্‌তে বাস। যে জাতি সেই চির সুখের জন্য লালায়িত, সেই কাম্য বস্তুর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সদা প্রস্তুত, তাদের বুক ভয়-হীন—পাষাণ! দুষ্‌মনের তেগ্‌-তলোয়ারের মুখে যেতে তারা কি ডরায়? মনে কর সেই বদরের লড়াইএর কথা। মুষ্টিমেয় মুসলমানের হাতে হাজার হাজার কাফেরের কি দুর্গতি হ'য়েছিল! তাই ব'লচি, ভাই সব! আল্লার নাম মুখে নিয়ে সাহসে বুক বেঁধে আগু বাড়ো—আল্লাই আমাদের সহায়, আল্লাই আমাদের ভরসা! আল্লার দয়ায় এই সব কাফেরকে আমরা ভেড়ার মত তাড়াইয়া দিব—আল্লাহ্‌-তা'লা আমাদের ফতেহ্‌ দিবেন।"

গাজী সাহেবের এই উত্তেজনায় মুসলমানগণ অস্ত্রে-শস্ত্রে সাজিয়া 'আল্লা আল্লা' 'আল্লাহু আকবর' রবে চারিদিক কাঁপাইয়া

শত্রু-সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন। নব মুসলমান্গণ অনেকে অস্ত্র ধারণ করিল, অবশিষ্টেরা যুদ্ধ-সম্ভারের তত্ত্বাবধান করিয়া চলিল। ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ তর্-তর্ বেগে তলোয়ার ঘুরাইয়া, নেজা-গোর্জ্জা, বর্শা-বন্দুক চালাইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিপক্ষের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। বীরগণের দাপট, তেগ্-তলোয়ারের সাঁই সাঁই—ঝন্ঝনা শব্দে, বন্দুকের ধূমে রণ-ভূমি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। বিপক্ষ পক্ষেরও বীরত্ব ভয়াবহ! তাহারা তীব্র তেজে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতেছে। রাজা মুকুট রায় ভাবিয়াছিলেন,—জন কয়েক মুসলমান বৈ তো নয়, নিশ্বাসে উড়াইয়া দিব। কিন্তু তাহাদের এত তেজ, এত বীরত্ব! এত তাহারা রণদক্ষ!! মুকুট রায় একথা একবার স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

রাজা দেখিলেন, গতিক বড় মন্দ, প্রথমেই তাঁহার সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। মুসলমানের বীরত্বের নিকট তাঁহার বীরগণ তিষ্ঠিতে পারিতেছে না; তিনি সসৈন্যে ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। ইস্লামের জয় ঘোষণা হইল, অলক্ষ্যে ফেরেশ্তাগণ মুসলমানদের শিরে পুষ্প বর্ষণ করিলেন। গাজী সাহেব কিছু দুর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ফিরিলেন এবং সেই রণ-ক্ষেত্রেই জয়-দাতা আল্লার উদ্দেশে দুই রেকাত নামাজ পড়িয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যুদ্ধে কয়েক জন ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান আহত হইয়াছিলেন। তাঁহারা গাজী সাহেবের দোওয়া এবং দাওয়ায় শীঘ্রই আরাম হইয়া উঠিলেন।

গাজী সাহের ভাবিয়াছিলেন,—শত্রু পলাইয়াছে, আর আসিবে না। কোন্ লজ্জায় আবার আসিবে ? কিন্তু এ আবার কি ! এক মাস পূর্ণ হইতে না হইতে আবার যুদ্ধের সাড়া—আবার গোলমাল ! এবার গাজী সাহেব মাতুল শাহ্ সফিউদ্দীন সাহেবকে সজ্জিত হইয়া আসিবার জন্য সংবাদ দিয়া নিজেও প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

এবার রাজা মুকুট রায়ের আয়োজন খুব বেশী। তিনি বহু সৈন্য লইয়া মুসলমান-দলনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ প্রথম বারের যুদ্ধ-কালে মুসলমান ধর্ম্ম-যোদ্ধগণের যে তেজোপূর্ণ ভীম মূর্ত্তি—যে অনল-বিক্রম দেখিয়া সঙ্কুচিত ও শঙ্কিত হইয়াছিল, সে শঙ্কা আর তাহাদের দূর হয় নাই। তাহারা পঙ্গপালের মত মুসলমানদের উপরে আসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু অনেকে তেমন তেজের সহিত অস্ত্র চালাইতে পারিল না।

এদিকে শাহ্ সফি সুলতান পাণ্ডুয়া হইতে আসিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত—তখন মুসলমানগণের তেজোবীর্য্য-সাহস শত গুণে বাড়িয়া উঠিল, তাঁহাদের স্ফুর্ত্তির সীমা রহিল না। তাঁহারা ঘন ঘন 'আল্লাহু আকবর'-ধ্বনিতে মেদিনী-গগন প্রকম্পিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভূতলে রক্ত-নদী বহিল, কত হিন্দু-বীর তলোয়ারের চোট খাইয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল। গাজীর যুদ্ধ-কুঠারে কত জনের মস্তক চূর্ণ হইল। কত জন নেজা-বর্শার প্রহারে—গোর্জ্জের ঘায় প্রাণ হারাইল। তথাপি মুকুট রায় বিচলিত হইলেন না। মুকুট রায় অমিত-সাহসী, প্রকৃত বীর, যুদ্ধে স্থির ! জয় বা মরণ পণ করিয়া তিনি সৈন্যদিগকে

দরাফ খান গাজী

সাহস দিয়া বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। বহু ক্ষণ যুদ্ধ চলিল, কিন্তু আর না—কেহ বুক বাঁধিয়া আর দাঁড়াইতে পারিল না,—মুকুট রায়ের হতাবশিষ্ট সৈন্য ছত্রভঙ্গ দিয়া পুনঃ পলায়ন করিল। তিনি মাত্র কয়েক জন শরীর-রক্ষী সৈন্য সহ দণ্ডায়মান রহিলেন। আর কি করিবেন? হতাশ-মলিন-মুখে দ্রুত এক দিকে অশ্ব চালাইয়া দিলেন, ইস্‌লামের জয় আবার ঘোষিত হইল। ঘন ঘন 'আল্লাহু আকবর'-রবে' রণক্ষেত্র এবং আকাশ ছাইয়া ফেলিল।

মুসলমানগণ পলায়িত হিন্দু-সৈন্যের পশ্চাতে ছুটিলেন। রাজা মুকুট রায় পথিমধ্যে সঙ্গীগণ সহ ধৃত ও বন্দী হইলেন। তাঁহার মহিষী এবং রাজ-কন্যা চম্পাবতীও বন্দিনী হইয়া আসিলেন। তাঁহারা সম্মানের সহিত ত্রিবেণীর মোস্‌লেম-শিবিরে আনীত হইলেন। রাজার ধন-দওলত ও যুদ্ধ-সম্ভার গাজী সাহেবের হস্তগত হইল।

কয়েক জন নব-দীক্ষিত মুসলমান, বৃদ্ধ সর্দ্দার সাহেব এবং পাণ্ডুয়া হইতে আগত দুইটী মোস্‌লেম বীর এই যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। শাহ্‌ সফি সুলতান, গাজী সাহেব এবং অন্য সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাদের মৃত দেহ মূল্যবান কাপড়ে আবৃত করিয়া, আতর-গোলাব-মেশ্‌ক্‌ মাখাইয়া মহাড়ম্বরে কবরস্থ করিলেন। পরে তাঁহাদের আত্মার কল্যাণার্থ জানাজা এবং ইস্‌লামের জয়ের জন্য আল্লার নিকটে প্রার্থনা করিয়া সকলে আহত সৈন্যগণ সহ মসজিদে আসিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাণ

"নিবিয়াছে মহাঝড়—রণ-প্রভঞ্জন।" আর ত্রিবেণীতে কোন গোলযোগ নাই; শত্রুদের মুখ বিবর্ণ—বাক্যহীন, মাথা হেঁট হইয়াছে। মুসলমানের বিশ্বত্রাস বীরত্ব দেখিয়া লোকে বিস্মিত, চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে। এক্ষণে গাজী সাহেব ও তৎসহযোগী মুসলমানগণ নিরুদ্বিগ্ন—নিশ্চিন্ত! সকলের আনন্দের সীমা নাই। ইস্‌লামের বিজয়ামোদে গাজী সাহেব দীন-দুঃখীদিগকে বহু দান-খয়রাত করিয়া নিজের চির অভ্যস্ত বিশেষত্ব বজায় করিলেন।

রাজা মুকুট রায় উপায়ান্তর না দেখিয়া রাণী ও কন্যার সহিত ভক্তিময়-প্রাণে ইস্‌লাম কবুল করিলেন। তাঁহার কন্যা চম্পাবতী অতি সুন্দরী এবং বিদূষী ছিলেন। রাজা প্রস্তাব করিলেন,—"আমার কন্যা রাজ-কন্যা এবং এ পক্ষের প্রধান পুরুষ এই জাফর খান গাজী। প্রধানের সহিত প্রধানের কন্যার মিলন হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা ও অনুরোধ। ভরসা করি, আপনারা আমার এই প্রস্তাব ও অনুরোধ গ্রহণে আনন্দিত করিবেন।" *

মহাত্মা শাহ্ সফিউদ্দীন একথা শুনিয়া যার-পর-নাই খুশী হইলেন। তিনি যথোচিত আয়োজনে সেই রাজকন্যার সহিত ভাগিনেয় গাজী জাফর খানের শুভ সাদী পড়াইয়া দিলেন।

* "গাজী সাহেব মুকুট রায়কে সবংশে ইস্‌লামে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহার কন্যা চম্পাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।" ইস্‌লাম প্রচারক—৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

এ উপলক্ষেও সাত্ত্বিক আমোদ এবং দান-খয়রাত যথেষ্ট করা হইল। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা শাহ্ সফিউদ্দীন কয়েক দিন ত্রিবেণীতে থাকিয়া ভাগিনেয় ও অপর সকলকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া সদলবলে পাণ্ডুয়া যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মস্‌জিদ-প্রাচীরের বাহিরে পৃথক্ পৃথক ভাবে কয়েকটী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার দুইটী গৃহে লায়লন্নেসা ও তাঁহার সখী বাহারন্নেসা ইতিপূর্ব্বেই স্থান পাইয়াছিলেন। এক্ষণে রাজকন্যা চম্পাবতী আর একটী গৃহের অধিকারিণী হইলেন।

কালক্রমে রাজকন্যা চম্পাবতীর গর্ভে গাজী সাহেবের দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয় পিতার ন্যায় গুণবান. ধার্ম্মিক ও বীর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্যাত্মা তাপস বার্ খান গাজী হুগলীর হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। *

পরিণত বয়সে গাজী সাহেবকে একটী প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এই শত্রু ভূদিয়ার মুসলমান-বিদ্বেষী হিন্দু রাজা। বলিতে প্রাণ বিদীর্ণ হয়, হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, নয়নে অশ্রু ভাসিয়া যায়, এই কাল-সমরে শত্রুগণের চক্রান্তে ধর্ম্মপ্রাণ সুফী জাফর খান গাজী শহীদ হইয়াছিলেন—তাঁহার পবিত্র জীবন-প্রদীপ ত্রিবেণী আঁধার করিয়া ত্রিবেণীর বাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণ কাঁদাইয়া নির্ব্বাণ লাভ করে—তাঁহার পবিত্র

---

* "বড় গাজী হুগলীর হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই হিন্দু-কন্যাও তাঁহার সহিত এই মস্‌জিদে সমাহিত হন।" —সুপ্রভাত—৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

আত্মা "জেন্নাতুল ফেরদৌসে" গমন করে। আর তাঁহার দেহ? পবিত্র পুরুষের পবিত্র দেহ? তাহা সমধিক সমারোহে শত শত ভক্ত হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়া তাঁহার সেই নির্দ্দিষ্ট কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁহার প্রিয় যুদ্ধ-কুঠার তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার শিয়রের প্রাচীরস্থ প্রস্তর মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কত কাল হইল, সে কুড়ালী পাথরে আটকাইয়া আছে, কত বর্ষা-বাদল সহিয়াছে, কিন্তু এখনো তাহা অবিকল বর্ত্তমান—এখনো সে "গাজীর কুড়ুল নড়ে চড়ে খশে না" অবস্থায় রহিয়াছে। (১)

পাঠক! ইচ্ছা হয় কি? মন দৌড়ায় কি? যান, একবার যান, ইস্‌লামের সেই পুণ্য-পীঠ, সেই মোস্‌লেম-কীর্ত্তির ধ্বংস-স্তূপ, সেই তাপসরাজের আস্তানা, মস্‌জিদ-মিনার দেখিয়া আসুন,—একবার ভক্তি-ভরা-প্রাণে অশ্রু বর্ষণ করিয়া আসুন। শ্রম ব্যর্থ হইবে না, অর্থ অপব্যয় হইবে না; আপনার হৃদয় প্রফুল্ল হইবে, অন্তর কি এক অমিয়ায় ভরিয়া যাইবে,—মোস্‌লেমের অতীত কীর্ত্তি-কথা স্মরণ করিয়া আপনার মনে যুগপৎ সুখ এবং দুঃখের উদয় হইবে।

ত্রিবেণীর এই প্রাচীর ও পবিত্র কবরস্থান দুই অংশে বিভক্ত। পশ্চিমের অংশে দরবেশ-প্রবর গাজী জাফর খান চির-বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার প্রিয়তম বেগম স্নেহের পুত্তলী পুত্রকে লইয়া সমাহিত রহিয়াছেন।

---

(১) "ইহা জাফর খাঁর হস্তস্থিত টাঙ্গীর ভগ্নাংশ।"

—সুপ্রভাত—৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

দরাফ খান গাজী

কবরস্থানের দ্বিতীয়াংশে গাজী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বার খান গাজী, প্রিয়তমা পত্নী এবং পুত্র রহিম খান গাজী ও করিম খান গাজীর সহিত চিরশান্তি ভোগ করিতেছেন।

গাজী সাহেবের প্রিয়তম সহচর ও নবদীক্ষিত মুসলমানগণও মস্‌জিদের আশে-পাশে নীরবে শয়ান রহিয়াছেন। আসুন, সকলে একবার শুদ্ধ মনে এই সকল মহাপ্রাণ পুরুষের আত্মার কল্যাণ কামনায় আল্লার দরবারে প্রার্থনা করুন।

কত কাল হইল তাঁহারা গিয়াছেন—তাঁহাদের নর-জীবনের পবিত্র লীলা-খেলা ফুরাইয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে; বৃষ্টি-বাদল-ঝঞ্ঝাবাত-ভূমিকম্পের আক্রমণে মস্‌জিদ-মিনার ভগ্ন, স্খলিত, ভূপতিত হইয়াছে। কেবল দীর্ঘ ঝাউ গাছ-গুলি আস্তানার অদূরে উচ্চশিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উদাস-প্রাণে শন্ শন্ শব্দে পথিককে বলিতেছে,—"নাই—নাই—কিছুই নাই; যে আনন্দ—যে পুণ্য-প্রবাহ এখানে বহিয়াছিল, তাহা আর নাই,—সব গিয়াছে,—চিরদিনের জন্য গিয়াছে,—আলোক নিবিয়াছে! ঐ দেখ কবরের পানে চাহিয়া,—দুনিয়া দু'দিনের জন্য! সুফী-সাধুরাও মাটীতে মিশিয়া গিয়াছেন—সে মাটীর দেহ মাটীতে লীন হইয়াছে; কেহই জগতে চিরস্থির নহে।" তথাপি ত্রিবেণীর সে জাহ্নবী-ধারা-চুম্বিত পবিত্র ভূখণ্ডের গৌরব-গুরুত্ব কমে নাই, সাধু-পুরুষের লীলাস্থলী বলিয়া পুণ্য তীর্থ-রূপে তাহা মানবের অন্তর আকর্ষণ করিতেছে এবং চিরদিন করিবে।
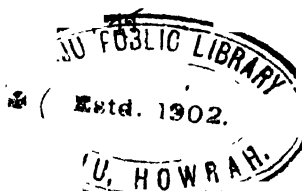
হক্ সাহেবের গ্রন্থাবলী

হজরত মহাম্মদ—হজরত রসুলে করিমের(দঃ)পবিত্র চবিতামৃত সুমধুর কবিতায় গ্রথিত। তৃতীয় সংস্করণ; আইভরি ফিনিশ কাগজে ঝর-ঝরে ছাপা; মূল্য ১৲; সুন্দর রেশমী বাঁধা ১।০ সিকা।

ভারতবর্ষ বলেন—"মহাপুরুষের জীবন যেমন পবিত্র,জীবনী-লেখকও তেমনি পবিত্রভাবে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন।" **প্রবাসী** বলেন—"পুস্তকখানির রচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে।" **মানসী ও মর্ম্মবাণী** বলেন—"পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।" **নবনূর** বলেন—এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কবি মোজাম্মেল হক্ সাহেব বঙ্গ-সাহিত্যে তথা মুসলমান সমাজে একটা স্থায়ী কীর্ত্তি-চিহ্ন রাখিয়া গেলেন।"

সঞ্জীবনী বলেন—পুস্তকখানি পাঠ করিলে লেখকের উন্নত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আশা করি, এই পবিত্র চরিতামৃত সর্ব্ব সম্প্রদায়ের আদরের সামগ্রী হইবে।"

হিতবাদী বলেন—"লেখক সুকবি; বর্ণনায় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। পুস্তক খানিতে সর্ব্বত্র লেখকের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।"

মহর্ষি মন্‌সুর—শোভন বেশে বর্দ্ধিত কলেবরে চতুর্থ সংস্করণ। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক **প্রাইজ ও লাইব্রেরীর** জন্য মনোনীত। এণ্টিক কাগজে সুন্দর ঝরঝরে ছাপা; সুদৃশ্য বাঁধা। মূল্য ১৲ টাকা।

প্রবাসী বলেন—"এই চরিত-কথা সকল সম্প্রদায়েরই অনুশীলন ও অনুধ্যানের বিষয়। লেখক বিশুদ্ধ বাংলায় এই মহর্ষির উপদেশ, ধর্ম্ম-মত, শিক্ষা প্রভৃতির সহিত তাঁহার জীবন-কথা বর্ণন করিয়াছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবিবার শিখিবার অনেক বিষয় পাইবেন।" **মানসী ও মর্ম্মবাণী** বলেন—"এই জীবনীখানিতে পড়িবার, বুঝিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে।"

বসুমতী বলেন—"ধর্ম্মবীর মহাত্মা মন্‌সুরের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী,—বিষয়টী যেমন সুন্দর, ঘটনাবলী যেরূপ চিত্তাকর্ষক, লেখাও তদনুরূপ প্রাঞ্জল হইয়াছে।"

ফেরদৌসী-চরিত—প্রাচ্যরাজ্যের 'হোমার' মহাকবি ফেরদৌসীর জীবন-বৃত্তান্ত। ৩য় সংস্করণ। মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

"ভাষা ও রচনা-প্রণালী উত্তম। যাঁহারা এই জীবন-চরিত পড়ি-

বেন, তাঁহাদের এই কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য **শাহ্‌নামা** পাঠ করা উচিত এবং যাঁহারা 'শাহ্‌নামা' পড়িবেন, তাঁহারা অবশ্য 'শাহ্‌নামা'র কবির কাহিনী পড়িবেন।"—**প্রবাসী**। "মুসলমানের লিখিত এমন সুন্দর বাঙ্গালা পাঠ করা আমাদের ভাগ্যে অতি কমই হইয়া থাকে। কবিবর মোজাম্মেল হক্‌ মহাশয়ের লেখনী অমর হউক।"—**বসুমতী**। "ফেরদৌসী কেবল কবি ছিলেন না, তিনি মনীষাময় সহৃদয় মানুষ ছিলেন। গ্রন্থকার বেশ মার্জ্জিত বাঙ্গালা ভাষায় ফেরদৌসীর চরিত্র-চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।"—**বঙ্গবাসী**।

শাহ্‌নামা—বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য পারস্য 'শাহ্‌নামা'র প্রাঞ্জল গদ্যানুবাদ। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত। প্রথম খণ্ড—মূল্য ১৸০ সিকা। (**২য় খণ্ড—যন্ত্রস্থ**)

বঙ্গবাসী বলেন—"এই 'শাহ্‌নামা' পাঠ করিলে একাধারে ইতিহাস ও উপন্যাস পাঠের সুখ অনুভূত হয়।"

হিতবাদী পুস্তক হইতে অন্যূন এক পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—"পাঠকগণ! শাহ্‌নামার এই ভাষা পাঠ করিয়া কি বোধ হয়, ইহা মুসলমানের লিখিত। যে বাঙ্গালী মুসলমান একবালে "খাজে ছাগ-পরস্তকে কোঁয়ায় ডালিবার বয়ান" লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে এক অদ্ভুত পরিচ্ছদ পরিধাপন করিয়াছিলেন, আজ সেই বাঙ্গালী মুসলমানই শ্বেত শতদলবাসিনী বীণাপানির সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া সাধনাবলে সিদ্ধিপথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন!"

প্রবাসী বলেন—"এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে একখানি জগৎ-বিখ্যাত কাব্যের পরিচয় লাভ করা বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ হইয়া যাইবে, এজন্য গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ। তিনি যে বিরাট কর্ম্মে হাত দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তোলা সহজ হইবে, পাঠক-সাধারণের সাহায্য পাইলে। * * অগ্রে এক কাল ছিল, যখন রাজারা লেখকদের উৎসাহ-দাতা ছিলেন; এখন সে ভার জন-সাধারণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।"

তাপস-কাহিনী—বড় পীর সাহেব, নিজামউদ্দীন আউলিয়া প্রভৃতি ৭ জন তাপসের জীবন-কাহিনী। **২য় সংস্করণ, মূল্য ৷৷০ আনা।**

"গ্রন্থের ভাষায় বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষায়

ব্যুৎপন্ন। আলোচ্য গ্রন্থের সাধু-চরিত্র যে আলোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।"—**বঙ্গবাসী**। "এই গ্রন্থে আউলিয়া বা মুসলমান মহর্ষিগণের অলৌকিক জীবন সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনীর প্রসঙ্গে এমন সমস্ত উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে, যাহা সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। সাত জন তাপসের কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।"—**প্রবাসী**।

জাতীয় ফোয়ারা—নব বেশে নূতন সংস্করণ। প্রাণোন্মাদিনী উচ্ছ্বাসময়ী সামাজিক কাব্য। ইহা নিদ্রিত সমাজের কর্ণে প্রাণস্পর্শী উদ্বোধন-সঙ্গীত। যেমন মনোরম কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালীতে ঝর-ঝরে ছাপা, তেমনি নয়নরঞ্জন ফ্যান্সী বাঁধাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র; কাগজের কভার ॥০ আনা।

প্রবাসী বলেন—"মুসলমান সমাজকে উন্নতির পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া চালিত করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত উচ্ছ্বাস। স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাস-প্রবাহের মধ্যে কবিত্বের আভা পড়িয়া চিকৃচিক করিয়া উঠিয়াছে।"

বঙ্গবাসী বলেন—"গ্রন্থকার আত্ম-জাতিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। প্রত্যেক কবিতায় তাঁহার স্বজাতি-হিতৈষণার পরিচয় যায়। গ্রন্থের ছাপাই. কাগজ ও বাঁধাই নয়নতৃপ্তিকর।"

জোহ্‌রা—সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। অভিনব বেশে ২য় সংস্করণ। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট; মূল্য ১॥০ টাকা।

যদি পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয়ের উজ্জ্বল ছবি—মুসলমানের গৃহ-সংসারের সজীব নক্সা দেখিতে চান, তাহা হইলে জোহ্‌রা পাঠ করুন। ভাষার মাধুর্য্যে. গল্পের সৌন্দর্য্যে, ঘটনার বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। মুসলমান, বেঙ্গলী, অমৃত বাজার প্রভৃতি পত্রিকায় প্রশংসিত।

ভারতবর্ষ বলেন—"এই উপন্যাস খানি পরম সুন্দর হইয়াছে। ভাষা বেশ ঝরঝরে, বর্ণনা-কৌশল অতি সুন্দর। এই পুস্তকখানির প্রশংসা মুক্ত কণ্ঠে করিতেছি।"

নায়ক বলেন—"এই উপন্যাস-প্রপীড়িত দেশে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের এমন একটী নিখুঁত চিত্র মৌলভী সাহেব আমাদিগকে দেখাইয়া বাধিত করিয়াছেন। তাঁহার 'জোহ্‌রা' মৌলিক গ্রন্থ, ইংরেজী গল্পের উদ্ভট অনুবাদ নহে। সাহিত্যামোদী হিন্দু মাত্রকেই আমরা 'জোহ্‌রা' পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হিন্দু-মুসলমানে ভাব

করিতে ত চাও, অথচ আধুনিক হিন্দু আধুনিক মুসলমানকে চিনে না—জানে না। 'জোহ্রা' সে অভাব দূর করিবে—তোমাকে মুসলমান সমাজের ছবি দেখাইয়া দিবে!"